উৎসর্গ পত্র

বাংলাদেশের শিক্ষকগণের উদ্দেশ্যে
মাতৃভাষার দীন সেবকের নিবেদন।

—লেখক

নিবেদন

ইতিহাস শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে একখানা পুস্তক লিখিবার ইচ্ছা বহুদিন হইতেই পোষণ করিয়া আসিতেছিলাম। প্রকাশক শ্রীচক্রবর্ত্তী মহাশয় যে সুযোগ দিলেন এজন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ। আমাদের দীনা মাতৃভাষার সেবা করিবার এই সুযোগ তিনিই আমাকে দিয়াছেন।

সাধারণ উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের দরিদ্র শিক্ষকের সন্তান আমি। শৈশবেই পিতৃহীন হই এবং শিক্ষকের জীবন যে কি পরিমাণ সংগ্রামের জীবন তাহা শৈশবেও কিঞ্চিৎ অনুভব করিতাম। তারপর দেখিয়াছি— দুর্ভিক্ষ, কালোবাজার, মহামারী, দেখিয়াছি শিক্ষকগণকে তাহার মধ্যেও নিয়মিতরূপে স্কুলে গমন করিতে এবং ছাত্রদের নিষ্পাপ মনের সান্নিধ্যে দুঃখ কষ্ট জ্বালা যন্ত্রনা বিস্মৃত হইবার চেষ্টা করিতে। অনেকেই অন্যায়ের নিকট মাথা নত করেন নাই। আমি তাই আমার এই পুস্তকখানা গভীর শ্রদ্ধার সহিত বাংলা দেশের শিক্ষকগণের নামেই উৎসর্গ করিলাম। তাঁহাদের প্রত্যেকের জীবনও তো একটা ইতিহাস।

পুস্তকে হয়তো ভুলত্রুটি থাকিয়া যাইবে কেন না শিক্ষার্থীগণের জন্য প্রকাশকের আগ্রহে তাড়াতাড়ি ইহা ছাপাখানা হইতে বাহিরে আনিতে হইল। বারান্তরে এই সমস্ত ত্রুটি সংশোধনের চেষ্টা করা হইবে।

পুস্তকের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে কেহ কেহ হয়তো বলিবেন যে সংক্ষিপ্ত করা হইয়াছে। এই বিষয়ে আমার বক্তব্য এই পুস্তকসমূহ স্নাতকদের চেয়ে নিম্নস্তরের শিক্ষার্থীগণের জন্য লেখা নহে এবং তাই বিস্তৃত বিবরণ বা বারংবার একই জল ঘোলা করিবার চেষ্টা করি নাই। বিষয় বস্তুতো ইচ্ছা করিলেই সম্প্রসারণ করা যায়—অধ্যয়নার্থীদের স্বকীয় বুদ্ধিবৃত্তি প্রকাশের ও কিছু কিছু ক্ষেত্র থাকা উচিৎ।

পুস্তকের সংশোধন মূলক যে কোনও ইঙ্গিতকে সাদরে বরণ করিব।

ভূমিকা

স্বর্গে দেবগণ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন—কলিযুগ সমাগত।

অতীতের কৃষ্টি, সংস্কৃতি, মহামানবদের কীর্ত্তি ও আদর্শ বুঝি বা লুপ্ত হইয়া যায়।

সুধী, জ্ঞানী, রাজনৈতিক, প্রাজ্ঞদের কাহিনী উত্তরকালের জন্য রচনা করা প্রয়োজন যেন ভবিষ্যতের আদর্শস্বরূপ হয়।

দেবরাজ ইন্দ্র গেলেন মহামতি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের নিকট। বেদব্যাস বলিলেন, "হাঁ আমি ইতিকাহিনী রচনা করিব উত্তর কালের জন্য। কিন্তু ইহা লিখিবার উপযুক্ত পাত্র কোথায়?"

সকলে সিদ্ধিদাতা গণদেবের নিকট উপস্থিত হইলেন।

গণেশ বলিলেন, "হাঁ, আমি ইতিহাস শুনিয়া শুনিয়া লিখিয়া যাইব কিন্তু আমি থামিতে পারিব না।"

বেদব্যাস বলিলেন, "বেশকথা, কিন্তু না বুঝিয়া লিখা চলিবে না।" অতএব প্রতি শ্লোকে সৃষ্টি হইল ব্যাসকূটের।

গণেশ ভাবিতে থাকিলেন—ব্যাসকূটের মর্ম্মছেদনে। মহর্ষি বেদব্যাস ততক্ষণে আর একটি শ্লোক রচনা করিলেন।

অপূর্ব এক ইতিহাস সৃষ্টি হইল।

তারপর বহু বৎসর অন্ধকারের মধ্য দিয়া চলিল।

রাজধানী কুসুমপুর।

ইতিহাস লিখিতেছেন বিষ্ণু গুপ্ত।

চানক্যের সেই ইতিহাস আজও অমর করিয়া রাখিয়াছে তাঁহাকে।

রাজধানী পাটলিপুত্র।

অনুশাসনবলি প্রচার করিলেন সম্রাট অশোক।

এলাহাবাদ।

হরিসেন লিখিলেন রাজা সমুদ্র গুপ্তের প্রশস্তি।

কালের অমর বক্ষে আজও তাহা উজ্জ্বল।

আরও কিছুকাল পর।

চৈনিক পর্য্যটক লিখিলেন হর্ষবর্দ্ধনের কাহিনী।

আরও কিছুকাল।

আরও কিছুকাল।

দিল্লীর প্রাসাদ।

বাবর লিখিতেছেন আত্মজীবনি।

নূতন আর একটি উপাদান।

আরও কয়েক বৎসর।

কালের বক্ষে সৃষ্টি হইল—তাজমহলের ইতিহাস! সৃষ্টি হইল মহারাষ্ট্রের ইতিহাস, সিপাহীদের ইতিহাস।

প্রতি বন, প্রান্তর, নদী, পাথর এমনি করিয়াই নীরবে লিখিয়া রাখিয়াছে অতীতের সত্য।

সে পাথরকে আজ কথা বলাইতে হইবে, সেই অন্ধকারে আজ আলোক সম্পাত করিতে হইবে।

মহেঞ্জোদড়ো, হরপ্পা, বৈশালী, কোশল, কাশী, কপিলবস্তু, সারনাথ, উরুবিল্ব, পাটলিপুত্র, পুরুষপুর, এলাহাবাদ, কান্যকুব্জ, কর্ণসুবর্ণ।

চল মন পাষানের বক্ষ হইতে রস বাহির করা যায় কিনা, বৈজ্ঞানিক অনুশীলনে, পর্য্যালোচনায়—কতটুকু লাভ হয় দেখি।

ইতিহাস শিক্ষক আমি; সত্যকে চিনিতে হইবে, জানিতে হইবে। বিশ্ববাসীকে পরম সত্যময়ের রূপ দেখাইতে হইবে, বলিতে হইবে;

"শোনো বিশ্বজন,
শোনো অমৃতের পুত্র যত দেবগণ—
দিব্যধামবাসী, আমি জেনেছি তাঁহারে
মহান্তপুরুষ যিনি আঁধারের পারে—
জ্যোতির্ম্ময়।"

সূচীপত্র

ইতিহাস শিক্ষা প্রণালী

প্রথম অধ্যায়

ইতিহাস কাহাকে বলে ?

ইতিহাস কথাটি আসিয়াছে 'ইতিহ' অর্থাৎ অতীতে যাহা ঘটিয়াছে তাহার ঐতিহ্য হইতে। ঐতিহ্য কাহাকে বলে? ঐতিহ্য হইতেছে অবিস্মরণীয় উপকরণসমূহ। আস অর্থ যাহাতে পাওয়া যায়। তাহা হইলে ইতিহাস কথাটির অর্থ দাঁড়াইল অতীতের ঐতিহ্যের ইতিহাস যাহার মধ্যে পাওয়া যায়। মহাকাব্যসমূহে উল্লিখিত আছে 'ইতিহাস কথোদ্ভূতম্— ইতরদ্বোবা সদাশ্রয়ম্ সংবস্তম্।' এই সমস্ত সংজ্ঞায় আমরা ইতিহাস অর্থে অতীতের কাহিনীই বুঝিতে পারি। ভারতবর্ষের মহাকাব্যের যুগে দেখা যাইত যে অশ্বমেধ যজ্ঞের সময় একদল গায়ক—দেবতাদের এবং অতীতের বীরদের উদ্দেশে তাহাদের কীর্ত্তি কাহিনীর গাথা গাহিত। এই সমস্ত গায়কদের বলা হইত সূত। হয়তো বা এই সমস্ত গায়কদের গাথার মধ্যেই প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের সূত্র নিহিত। ইংরাজি History কথাটি আসিয়াছে গ্রীক 'historia' কথাটি হইতে। এই গ্রীক শব্দটির অর্থ সত্য অনুসন্ধান করিবার উদ্দেশ্যে অনুধাবন।

বাস্তবিকপক্ষে ইতিহাসের সংজ্ঞা সম্বন্ধে মনীষিগণের বিভিন্ন অভিমত যেমনই চিত্তাকর্ষক তেমনি পরস্পর বিরোধি।

বীরশ্রেষ্ঠ নেপোলিয়ান বলিতেন, "ইতিহাস হচ্ছে কতগুলো সর্ব্ব-সম্মত গল্পমাত্র।" আবার ইংলণ্ডের বীরবর ক্রমওয়েল বলিতেন, "ঈশ্বর ইতিহাসের মাধ্যমেই সত্যরূপে প্রকট হন।" বিখ্যাত ঐতিহাসিক মেটল্যাণ্ড (Maitland) বলিতেন, "মানুষেরা যাহা বলিয়াছে এবং করিয়াছে এবং সর্ব্বোপরি তাহারা যাহা ভাবিয়াছে—তাহাই তো ইতিহাস।" Froude মনে করিতেন ইতিহাস যুগ যুগান্তরের ন্যায় এবং অন্যায়ের বানী" আর একজন ঐতিহাসিক বলেন, "জীবন দর্শনের

মূল্যবান খনি ইতিহাস। জীবিত মানব ইতিহাস পাঠ করে এজন্য যেন সে জর অপরের অভিজ্ঞতা হইতে জ্ঞান অর্জ্জন করিতে পারে।"

ইতিহাস কি ?

অতীতের সভ্যতা এবং মানবসমাজ কি ভাবে বাড়িয়া উঠিয়াছিল এবং কোন কোন স্তরের ভিতর দিয়া আমরা আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় পৌছিয়াছি, মানুষ সমাজে অতীতে কি করিয়াছে এবং তাহার সহিত বর্ত্তমান সমাজের কি সম্পর্ক, সভ্যতার কি সম্পর্ক এই সমস্তই ইতিহাসের উপাদান। একটি ভবিষ্যমানবের চরিত্রগঠনে ইতিহাসের অবদান অসামান্য। ইহ, বুদ্ধিবৃত্তির প্রখরতা সম্পাদন করে এবং জ্ঞান আহরণেচ্ছুদের দ্বার উন্মুক্ত করে। বিখ্যাত চিন্তাশীল মনীষি ভলটায়ার (Voltaire) বলিয়াছেন, "আমার আকাংখা—কতগুলি ঘটনা সমাবেশ পূর্ণ ইতিহাস লেখা নহে, আমার ইচ্ছা জগৎকে জানান যে মানবসভ্যতা কি প্রকারে আদিম অবস্থা হইতে বর্ত্তমান অবস্থায় পৌছিয়াছে।"

ইতিহাসকে পূর্ব্বে যে দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা হইত—উনবিংশ শতাব্দির পর হইতে সে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্ত্তন আসে। ঐতিহাসিক হিসাবে আমরা আমাদের দেশের মহর্ষি বেদব্যাস, বাল্মীকি মুনিকে, পুরাণের লেখকগণকে রাখিতে পারি কিনা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। পাশ্চাত্য দেশের উনবিংশ শতাব্দির প্রাক্ ঐতিহাসিকদের মধ্যে হেরেডোটাস, গিবন, হিউম, মেকলে র নাম উল্লেখ করা যায়। ইতিহাসের নূতন সংজ্ঞাহইল কেবলমাত্র সত্যের অনুসন্ধান। এই অনুসন্ধান কার্য্যে কোনও ভাবাবেগের স্থান নাই, কোনও বাগাড়ম্বরের স্থান নাই, কোনও নৈতিক মতামত প্রকাশের স্থান নাই। প্রকৃত ইতিহাস দিবে অন্ধ দেশ প্রেমের উপরে সত্যের মর্য্যাদা। ইতিহাসের কাজ কাগজপত্র পরীক্ষান্তে একটা জাতির উন্নতির ইতিহাস কাহিনীর প্রকৃত সত্যকে বাহির করা। গীতায় আছে "নিরুদ্বিগ্ন মানসঃ" —তাই হইতে হয়। কবি মিলটন বলিয়াছেন, "ইতিহাস হচ্ছে বিস্তৃত গল্পমাত্র।" আমরা কি তাহা স্বীকার করিতে পারি ? কবি ফেরদৌসীর

একটি চমৎকার কথা আছে—"ইতিহাস যাহা বর্ণনা করে—ছন্দ তাহা চিত্রিত করে।"*l* বাস্তবিকপক্ষে প্রাচীন যুগের তমিস্রা ভেদ করিয়া আমরা কি এই প্রকারে ইতিহাসের উপাদান পাই না? প্রাচীন যুগের কাব্য গাথার মধ্যে কি আমাদের ঐতিহাসিক সূত্র পাই না? উহাই কি আমাদের ইতিহাস?

হেরোডোটাসকে বলা হয় ইতিহাসের পিতা। সিসারো প্রথমতঃ তাঁহকে এই সংজ্ঞা দেন। খৃষ্টপূর্ব্ব ৪৮৪ অব্দে হেরোডোটাস এশিয়া মাইনরএর দক্ষিণে হালিকার্ণাশাস নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। পারস্য রাজের প্রভুত্ব নিরসনকল্পে যে বিদ্রোহীবাহিনীর সৃষ্টি হয়—তিনি সেই দলে যোগদান করেন। তাহার খুল্লতাত এই গ্রীক মুক্তিফৌজের একজন নেতা ছিলেন। খুল্লতাতকে বন্দী করিয়া লইয়া গেলে, তিনি স্যামস নগরীতে পলায়ন করেন। সেখানে থাকাকালীন তিনি আয়ণীয় ভাষা শিক্ষা করিয়া ঐ ভাষায় ইতিযাস রচনা আরম্ভ করেন।

ইহার পরবর্তি ইতিহাস পড়িয়া মনে হয় তিনি দেশ দেশান্তরে পরিভ্রমণ করিতে করিতে এথেন্সে উপনীত হন এবং সম্ভবতঃ সে সময় তাঁহার সহিত পেরিক্লিস, সোফেক্লিজ প্রভৃতির সহিত পরিচয় হয়। এথেন্সবাসীগণ তাঁহ্যর জন্য একটি বৃত্তিও নির্দ্ধারিত করিয়া দেন।

তাঁহার পরিভ্রমণের অভিজ্ঞতা লইয়াই তিনি ইতিহাস রচনা করেন। তিনি মিশর, পারশ্য, বেবিলন—প্রভৃতি দেশও পরিভ্রমণ করেন। তাঁহার এই পরিরভ্রমনকেই আমরা বলিব সত্যের সন্ধানে ঐতিহাসিকের পরিভ্রমন। সম্ভবতঃ তিনি খৃষ্টপূর্ব ৪২৭ অব্দ হইতে ৪১৫ অব্দের মধ্যে মারা যান।

তাঁহার আদি ইতিহাস রচনা প্রসঙ্গে একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক বলিয়াছেন, "সে যুগে জগৎ ছিল এক রহস্যময় বিস্ময়ের বস্তু। সে সময় এক মণীষা সমগ্র জগতের মানবের সংগ্রামের রোমাঞ্চকর কাহিনীই কেবল লিপিবদ্ধ করিয়া ক্ষান্ত হয় নাই—তাঁহার স্থিতধী দিয়াছে উত্তর কালকে মানবজগতের ইতিহাসের এক অপূর্ব্ব উপাদান—অমূল্য অবদান।"

তিনি তদানীন্তন জগতের সমগ্র মানবকে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে অধ্যয়ন করেন—কোনও কিছুর জন্য তিনি অত্যধিক আবেগও প্রকাশ করেন নাই—এবং কোনও বিষয়ে নিরুত্তাপের ব্যাঞ্জনাও দেন নাই। তিনি মানবধর্মী এবং মানবদরদী। সমাজের কোথায় কি তাঁহার গ্রহণযোগ্য আছে—দ্রুত তাহা স্পর্শ করিয়া সৃষ্টির তুলিতে রূপায়িত করেন। তিনি বিচক্ষণ, ভদ্র, মানবের চরিত্রের দুর্ব্বলতার সহিত পরিচিত এবং বর্ণনা প্রসঙ্গে ধীরস্থির নিরুদ্বিগ্ন।" তিনি এমনও স্থানে স্থানে লিখিয়াছেন—"এপর্যন্ত আমার মন্তব্য, আমার বিচার দৃষ্টিভঙ্গি ও গবেষণার ফলাফল লিপিবদ্ধ করা হইল। ইহার পর আমি লোকপ্রবাদ সম্বন্ধে লিখিতেছি।" অতএব এই হেরেডোটাসই ইতিহাসের স্রষ্টা বলিয়া পাশ্চাত্য জগত স্বীকার করেন। আমরা হেরেডোটাসের কথা লিখিলাম এজন্য যে জগতের হতিহাস কাহাকে বলে বুঝিতে হইলে উপরে লিখিত মতামত ও আদি ইতিহাস সৃষ্টির সহিত সকলের পরিচিত হওয়া প্রয়োজন।

ইতিহাস কি এবং ইহার উদ্দেশ্য কি হওয়া উচিত এই প্রসংগে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের অষ্টাদশ অধিবেশনের সভাপতিরূপে সর্দ্দার কে, এম, পাণিক্কার যাহা বলিয়াছেন—তাহা বিশেষ প্রণিধান যোগ্য।

তিনি বলিয়াছেন, "ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণ—ইতিহাসকে কেবলমাত্র এক জাতির রাজনৈতিক অভ্যুত্থানের বিবরণ বলিয়াই ভাবিতে শিখিয়াছিলেন ; বিক্ষিপ্ত রাষ্ট্রশক্তির তলে জনসাধারণের এক সুসমঞ্জস সভ্যতার কাহিনী হিসাবে ভাবিতে শিখেন নাই। ইহারা রাষ্ট্রকে ব্যক্তিরূপ দিয়াছিলেন এবং ইহাদের ধারণায় ইতিহাস ছিল সেই যৌথ ব্যক্তিত্বের জীবন কাহিনী। কিছুকাল পূর্ব্বেও ইউরোপে এই ধারণা প্রচলিত ছিল যে ইতিহাস শুধু জাতীয় রাষ্ট্রের উত্থান বিবরণ। পশ্চিম ইউরোপীয় দেশ সমূহের বিশেষ অবস্থায় ইহাই স্বাভাবিক ছিল যে, যে-স্বল্পকাল ব্যাপিয়া তাহাদের ইতিহাস, তাহার সহিত তাহাদের

স্বাধীন জাতি হিসাবে উত্থান ও বৃদ্ধির সময়টা মিলাইয়া দেওয়া হইবে এবং যুদ্ধ, দেশজয় এবং পার্লামেণ্ট ও মন্ত্রীসভায় ক্রিয়াকলাপের বিবরণই ইতিহাসের আখ্যানবস্তু হইমে। কিন্তু সেই ইউরোপেও ইউরোপীয় জীবনধারা ও সংস্কৃতির ঐক্যের ক্রমোপলব্ধি ইতিহাসকে বড় করিয়া সমগ্র পৃথিবীর পটভুমিকায় ইউরোপীয় সভ্যতার প্রসারের কাহিনী দেখিবার দিকে ঠেকিয়াছে। ইংলণ্ডে এই ধারার সূত্র আনিয়াছেন অ্যাক্টন। এই অভিজাত ক্যাথলিক ইংরাজ মনীষী ছিলেন মনে প্রাণে আন্তর্জ্জাতিক। ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে গত এক চতুর্থ শতাব্দীকাল ধরিয়া ইংলণ্ডে যে কয়টি অত্যন্ত মূল্যবান ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচিত হইয়াছে তাহার অনেকগুলি ইউরোপ বিষয়ক—ইংলণ্ড-বিষয়ক নহে। আধুনিক ইতিহাসকারদিগের মধ্যে সর্ব্বাগ্রগণ্য হেনরি পিরেন তাঁহার "মোহাম্মদ ও শার্লামেন" পুস্তকে কোন দেশ লইয়া আলোচনা করেন নাই,—করিয়াছেন দুইটি সম্মুখিন সভ্যতা লইয়া।

"প্যারিস বিশ্ব বিদ্যালয়ে প্রখ্যাত ফার্ণাণ্ড ব্র্যাণ্ডেলের নামের সহিত জড়িত যে নূতন ঐতিহাসিক মতবাদ ক্রমশঃ গড়িয়া উঠিতেছে সেটিও এইস্থলে সমভাবে উল্লেখযোগ্য। ব্র্যাণ্ডেলের যুগান্তরকারী রচনার বিষয়বস্তু হইতেছে দ্বিতীয় ফিলিপের সময়কার ভূমধ্য-সাগর তীরস্থ জগৎ। ইতিহাসকে পূর্ণাঙ্গ সভ্যতার সহিত যুক্ত করিয়া গাঁথিবার চেষ্টা।

"ভারতবর্ষে আমরা অদ্যাপি পুরাতন ভাবধারা অনুসরণ করিয়া নিজদের স্থানীয়—রাজকুলপঞ্জী লইয়া আবদ্ধ রাখিয়াছি—অথবা ভারতীয় রাষ্ট্রীক অখণ্ডতার নিষ্ফল সন্ধানে ফিরিতেছি। ইহার ফলে ভারতে একটি উগ্র আঞ্চলিকতা দেখা দিয়াছে। এ ধরণের ইতিহাস চর্চ্চা—রাজবংশকেন্দ্রী আঞ্চলিকতাকে বাড়াইয়া তুলিয়া ভারতীয়—ঐক্যকেই অস্বীকার করিতে থাকে। এইরূপে অতীতকালে ভারতীয় জাতীয়তার মরীচিকা সন্ধান আঞ্চলিক ঈর্ষা-রেষারেষিতে পরিণত হইতেছে।

"ইতিহাসের অনুসন্ধান মানুষের সাহিত্য কর্মের মধ্যেও খুঁজিতে হইবে........................

'ভারতীয় ইতিহাস—চর্চার প্রসঙ্গে আর একটি দরকারী কথা বলিবার আছে। সভ্যতার ইতিহাস রচনার উপর জোর দিলে ভারতীয় ইতিহাসের সীমানা অনেকখানি বাড়িয়া যায়, কেননা ভারতীয় সভ্যতা একদা চতুর্দিকে ব্যপ্ত হইয়া দক্ষিণ-পূর্ব ও মধ্য এশিয়ায় হিন্দু ধর্মাশ্রয়ী জাতিসমূহের উদ্ভব ঘটিয়াছিল ; যাহাদের সাংস্কৃতিক এবং রাষ্ট্রিক কীর্তি কলাপকে বৃহত্তর ভারতীয় ঐতিহ্যের অংশ বলিয়া ধরা উচিত।............ আমাদের ভারতীয় ইতিহাসদৃষ্টি সম্পূর্ণ প্রসারিত করিতে হইবে।

"পরিশেষে ভারতীয় ঐতিহাসিকদের নিকট একটি আবেদন জানাইব। তাঁহারা যেন কোনও একটি বিশিষ্ট কাল বা অঞ্চল লইয়া বিশেষ চর্চা করিতে গিয়া আঞ্চলিক মহিমাকীর্ত্তনের অনিষ্টকর প্রচেষ্টার সহিত জড়াইয়া না পড়েন। ভারতের প্রতিটি অঞ্চলই ভারতের জনগণের অগ্রগতির সহায়তা করিয়াছে ; প্রতিটি সম্প্রদায়ের দানে আমাদের ঐতিহ্য পুষ্ট। কোন একটি সময়ে যদি একটি দল পিছাইয়া পড়ে সাধারণ হিসাবে মিলাইলে সকলের দানেরই মূল্য পাওয়া যাইবে। আমি চাই যেন এই দৃষ্টিভঙ্গী প্রতিটি ইতিহাসের ছাত্র অন্তর দিয়া গ্রহণ করিতে পারে, কারণ ইহার ব্যতিক্রম আমাদের অনৈক্য ও অনর্থের পথে লইয়া যাইবে।"

(ইতিহাস পত্রিকা হইতে সঙ্কলিত)

সভাপতিরূপে সর্দ্দার পানিকর এর বক্তৃতা ভারতের ইতিহাসের ধারা অনুসরণে তথা বিশ্বের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সন্ধান আমাদের এবং উত্তর কালের পথপ্রদর্শকরূপে থাকিবে। তবেই আমাদের ঐতিহাসিক রূপে দৃষ্টিভঙ্গী সার্থক হইবে। তাঁহার এই উক্তি তাঁহার পরিমিতি বোধের পরিচায়ক, সুমঞ্জস এবং মোহমুক্ত কল্পনা উদার। "ব্রাত্যস্তং প্রাণ"—হে প্রাণ তুমি সংস্কারে বিজড়িত নও—রবীন্দ্রনাথের নূতন যুগের নূতন বাণী গ্রহণ করিয়া যেন ঐতিহাসিক ইতিহাস অধ্যয়নে এবং অধ্যাপনায় অগ্রসর হন।

ইতিহাসের সংজ্ঞা লইয়া আমরা আর আলোচনা করিব না। এইবার আমরা ইতিহাসের গণ্ডী এবং মূল্য সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

ইতিহাসের যদি কোনও মূল্যই না থাকে তবে ইহা পাঠ করা বা পড়াইবার প্রয়োজনই বা কি ?

প্রাচীন যুগ হইতেই ইতিহাস এক উপেক্ষিত সাহিত্যরূপে গ্রথিত হইয়া আসিয়াছে।

প্রাচীন যুগের ইতিহাস তো সাহিত্যরূপেই পরিচিত। অতএব সাহিত্যের ভিতর যে কল্পনা চলে—ইতিহাসও সে কল্পনার উপাদানে রচিত হইত। ইহার উৎপত্তির ইতিহাস অনুসন্ধান করিতে গেলে আমরা হয়তো দেখিতে পারি—ইহা একটি উপকথা বা আখ্যায়িকা রূপে জীবন আরম্ভ করে। চিত্তাকর্ষক কাহিনী রচনা করিবার জন্য প্রয়োজন হয়—কল্পনা, অবাস্তব এবং রোমাঞ্চকর উপাদান। প্রাচীন ইতিহাসও তাই ঐ সমস্ত মালমশলায় গঠিত। কোনও ইতিহাস লেখার চেষ্টাও কোন দিন হয় নাই। বংশানুক্রমে—বাচনিকভাবে উহা চলিয়া আসিত। এই সমস্ত কাহিনীর রচয়িতাগণ চাহিতেন পাপ এবং পুণ্যকে অতিরঞ্জিত করিয়া চিত্র করিতে যাহাতে শ্রোতৃবৃন্দের মন স্বভাবতঃ পাপ হইতে বিরত হইয়া পুণ্যের দিকে যায়। ভীরুতা, দুর্ব্বলতা এবং কাপুরুষতাকেও তেমনি হেয় করিয়া কল্পিত বীরত্বের কাহিনীতে উহা গঠিত হইত। অতএব ইতিহাসের কাহিনীর মধ্যে প্রবেশ করিত অপ্রাকৃত এবং অবাস্তব জিনিস। মানবকে অতিমানবরূপে চিত্রিত করিয়া—বাস্তব এবং উপকথায় মিশ্রিত করিয়া ইতিহাসের কাহিনী রচিত হইত।

বৈজ্ঞানিক পন্থায় ইতিহাস লেখার সূচনা করেন Niebuhr—জর্ম্মান দেশীয় লোক। একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক বলেন, "রোমের ইতিহাসকে তিনিই প্রাণবন্ত করিয়া রচনা করেন এবং তাঁহারই প্রচেষ্টায় ইতিহাস সর্ব্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক ভিত্তি প্রাপ্ত লইল।" তাঁহার দেখাদেখি সমগ্র ইউরোপে নূতন সাড়া পড়িয়া গেল। সুধীগণ জর্ম্মান সেমিনারে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া সমগ্র ইউরোপে ছড়াইয়া পড়িলেন এবং নূতন নূতন পন্থায় বৈজ্ঞানিকভাবে ইতিহাসের তত্ত্বানুসন্ধানে মগ্ন হইলেন। ভু-বিখ্যাত ঐতিহাসিক গার্ডিনার, টাউট, মেটল্যাণ্ড—এই গবেষণারই ধারা অনুসরণ করেন।

এই যুগের ঐতিহাসিকগণের মধ্যে স্টাবস (Stubbs) এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি বৈজ্ঞানিক পন্থায় যে Constitutional History বই লিখিলেন, তাহার সম্বন্ধে নিজেই গর্ব্ব করিয়া বলিলেন, "আমি যে ইতিহাস লিখে যাচ্ছি—ওর মধ্যে কেউ আমার রাজনৈতিক মতামত কি জানতে পারবে না।"

বাস্তবিকপক্ষে প্রকৃত ঐতিহাসিক তো তিনিই যিনি ঋষির ন্যায় সত্যদ্রষ্টা। কেবল সত্যের অনুসন্ধানই তিনি করিবেন।

এই সমস্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নেপোলিয়ান বোনাপার্টের কথা যে ইতিহাস মিথ্যাকথায় পরিপূর্ণ—আমরা তাহা সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিতে পারি কি? অতীতের ইতিহাস কি তাহাই ছিল না! জর্ম্মান দেশের নবপ্রচেষ্টায় কি ইতিহাসকে সত্যের আঁওতায় আনা হইল না?

একবার আমরা ভারতবর্ষের দিকে তাকাই। সেখানে কি দেখিতে ..ই? অন্ধকূপহত্যার ন্যায় বহু মিথ্যায় ইতিহাস পরিপূর্ণ। আমরাও ..াল্যকালে বহু মিথ্যা পরিপূর্ণ ইতিহাস পড়ি নাই কি? যাঁহারা বিদ্যালয়ে পড়ান তাঁহারা অনেকেই জানেন বাংলাদেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান-সমূহে এমন আদেশও জারি করা হইয়াছিল যে মহম্মদ তুঘলকের হত্যা-ষড়যন্ত্র আলাউদ্দিন খিলজির খুল্লতাত হত্যা, ঔরঙ্গজীবের ভ্রাতৃহত্যার কাহিনী গোপন করিয়া ইতিহাস পড়াইতে হইবে। ভারতবর্ষেও ইতিহাসের নূতন রূপের ঢেউ আসিয়া পৌছিয়াছিল। ভারতের ঐতিহাসিকগণও পরাধীন অবস্থায়ও প্রকৃত ইতিহাস রচনার প্রচেষ্টায় বিরত থাকেন নাই।

প্রকৃতপক্ষে উনবিংশ শতাব্দি হইতেই আরম্ভ হইল বৈজ্ঞানিক পন্থায় ইতিহাস রচনা।

অতীতের ইতিহাস চাহিয়াছিল কেবল রাজনৈতিক বা ধর্ম্মসম্বন্ধীয় প্রচার কার্য্য, ইহা রাজনৈতিক দিককে প্রাধান্য দিয়া সামাজিক দিককে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করিত, এবং কোনও বৈজ্ঞানিক পন্থাও অনুসরণ করিত না।

বর্ত্তমান ইতিহাস মানবজাতি এবং জগতকে লইয়া লিখিত। ইহা ব্যক্তির মূল্য ততটুকুই নির্দ্ধারণ করে যতটুকু সে মানবকল্যাণে প্রয়োগ করিতে পারে। সমাজের বিবর্ত্তনবাদ এবং পরিক্রমাও ইতিহাসের লক্ষ্য। বিশৃঙ্খলার কাঠামোর ভিতর দিয়া শৃঙ্খলাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া—ঘটনার সুশৃঙ্খলার সামঞ্জস্য স্থাপনও ইহার লক্ষ্য। দোষগুণ সমালোচনা ইতিহাসের লক্ষ্য নহে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে ইতিহাস মানব ও মানবসমাজের ক্রমবিবর্ত্তনের আখ্যায়িকারাজি। ইহা আমাদের অতীতকে বৈজ্ঞানিক পন্থায় অনুসরণ করা। Maitland বলিয়াছেন—মানুষ যাহা করিয়াছে বলিয়াছে এবং চিন্তা করিয়াছে—উহাই ইতিহাস। চমৎকার কথা।

ইতিহাস কি বিজ্ঞান না কলা ?

অনেকে বলেন, ইতিহাস কতগুলি স্বাধীন মতসম্পন্ন স্বাধীন কার্য্যাবলীর বিবরণ। একজন স্বাধীন মতসম্পন্ন লোকের কাজের সহিত অপরের কোনও সাদৃশ্য থাকে না। ইতিহাসের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে—ইহাও সত্য কথা নহে। অতএব ইতিহাস পড়িবার কোনও প্রয়োজন যেমন নাই—তেমন ইহাকে কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর দাঁড়া করান চলে না। বিজ্ঞান প্রকৃতির ভিত্তিতে গঠিত। বিখ্যাত শিক্ষাবিদ স্পেন্সার ইতিহাসকে কোনও প্রাধান্য দেন নাই—কারণ তিনি বলিতেন "ইতিহাসের ঘটনাবলি হইতে কোনও তত্ত্ব বা শিক্ষাও নির্দ্ধারণ করা চলে না। ইতিহাসের ঘটনারাজি অসংবদ্ধ এবং ইহার উপর সুশৃঙ্খল কোনও নিয়ম দাঁড় করান যায় না।" ইতিহাসের Dataসমূহ কোনও বৈজ্ঞানিক গবেষণায় কাজে লাগে না।

এইঁ সমস্ত যুক্তিকে আমরা খণ্ডন করিতে পারি না। রসায়ণ বা পদার্থবিদ্যার ন্যায় ইতিহাসতো বাস্তবিকই পরীক্ষা-সাপেক্ষ বিষয় নহে বা জ্যোতির্বিদ্যার ন্যায় লক্ষ্য-সাপেক্ষ বিষয়ও নহে।

ইহা একটি সমালোচনাময় বিজ্ঞান।

ইহার কার্য্য হইতেছে প্রকৃত ঘটনাসমূহের নিষ্ঠাময় অনুসন্ধান। তাহার পর উহা বাস্তব বা অবাস্তব পরীক্ষা করা এবং তৎপর উহার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করা। এই অনুসন্ধানরত ঐতিহাসিককে একান্তরূপে দ্বেষ-গর্ব্ব নিন্দা-প্রশংসার উর্দ্ধে অবহিত হইয়া কাজ করিতে হইবে।

ইতিহাস যখন বৈজ্ঞানিক পন্থায় তত্ত্ব অনুসন্ধান করে তখন ইহাকে বিজ্ঞান বলিব না কেন? হয়তো ঐতিহাসিকের পক্ষে বৈজ্ঞানিকের ন্যায় সব সময় কোন ঘটনার পারম্পর্য্যে কোন ঘটনা অতঃপর আসিতে পারে বলা যায় না, তবুও ঐতিহাসিক ইচ্ছা করিলেই তাঁহার পরিক্রমায় বৈজ্ঞানিক পন্থা অনুসরণ করিতে পারেন। হাক্সলি বলেন, "বিজ্ঞান অর্থে আমি বুঝি যুক্তি এবং প্রত্যক্ষ লক্ষ্যের উপর গঠিত সমস্ত প্রকার জ্ঞান।" আর একজন অধ্যাপক বলেন; একটি ঘটনার (Phanomenol) পরিক্রমার সুশৃঙ্খল আবর্ত্তরাজির অনুসরণই বিজ্ঞান। এই দুইটি সংজ্ঞার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা ইতিহাসকে বিজ্ঞান বলিতে পারি না কি?

পুনরায় চিন্তা করিলে দেখা যায় ইতিহাস তো অতীতের সুস্পষ্ট মনোজ্ঞকর বর্ণনা। এই বর্ণনায় প্রয়োজন হয় সাহিত্যিক শক্তিপ্রতিভার। এইদিক হইতে ইতিহাসকে কলাবিদ্যার পর্য্যায়ে ফেলা যায় না কি?

সংক্ষেপে বলিতে গেলে আমরা যখন সত্যের অনুসন্ধানে রত হই এবং তত্ত্বসমুহ খুঁজিয়া খুঁজিয়া বাহির করি, তখন আমরা বৈজ্ঞানিক এবং উহা বাহির করার পর যখন আমরা বর্ণনার আশ্রয় গ্রহণ করি, তখন আবার কলার আশ্রয় লই। ইতিহাসের উভয়বিধ অংশই প্রয়োজনীয় এবং উভয়ই বিজ্ঞান ও কলার অন্তর্ভুক্ত। অতএব ইতিহাসকে উভয় পর্য্যায়েই রাখা চলিতে পারে। সত্যকে অতিরঞ্জিত না করিয়া বা বিকৃত না করিয়াও মনোজ্ঞরূপে বর্ণনা করা চলে। ইহাই ইতিহাসের কাজ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইতিহাস পড়ার উদ্দেশ্য ও মূল্য

উদ্দেশ্য কাহাকে বলে ?

আমরা যখন একটি বিষয়কে নির্দ্দিষ্ট রূপে লক্ষ্য রাখিয়া বিষয়বস্তুর দিকে অগ্রসর হইতে থাকি—সে লক্ষ্যটিই হয় আমাদের মুখ্য বিষয় অর্থাৎ উদ্দেশ্য। আমরা কাজটি সম্পাদন করিই এজন্য যেন আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌছিতে পারি। শিক্ষক ছাত্রকে পড়ান—তাতে লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য ছাত্রকে মানুষ করা। ছাত্র শিক্ষিত হইলে তখন প্রশ্ন আসে—এই শিক্ষার প্রকৃত মূল্য কি বা কতটুকু সার্থক হইল। আমাদের বাংলা দেশে একটা প্রচলিত কথা আছে—শিব গড়িতে গিয়া বাঁদর তৈরী হইল। উদ্দেশ্য একটা হইতে পারে—কিন্তু ফল অন্যরূপ দাঁড়াইতে পারে এবং মূল্যও সে অনুসারে অন্যরূপ হইতে পারে। উদ্দেশ্য আমাদের অনেক সময় একটি থাকিতে পারে—কিন্তু মুল্য অনেক হইতে পারে। একটি কাজ হয়তো একটি উদ্দেশ্য লইয়াই আরম্ভ করা যাইতে পারে—কিন্তু কাজটিতে হাত দিতে গিয়া অভিজ্ঞতা লাভ হয় ছ প্রকারের। এই অভিজ্ঞতাগুলিই দাঁড়ায় সে কাজের মুল্য। সম্রাট অশোক কলিঙ্গবাসীদের দমন করিবার উদ্দেশ্য লইয়াই যুদ্ধ করেন—কিন্তু যুদ্ধের অভিজ্ঞতার ফলে—তাঁহার জীবনধারা আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। অতএব উদ্দেশ্য—ও অভিজ্ঞতা বিভিন্ন প্রকারের হয় এবং হইতেও পারে। কলম্বাসের উদ্দেশ্য ছিল ভারতে আসার পথ আবিষ্কার করা। কিন্তু তিনি আবিষ্কার করিলেন আমেরিকা। তারপর অভিজ্ঞতাও হইল অন্যদিকে।

ইতিহাস পাঠের উদ্দেশ্য কি ?

ইতিহাসের শিক্ষক গর্ব্ব করিয়া বলিতে পারেন যে তিনি যে জ্ঞানের বীজ রোপন করিবেন—তাহা সুদূর ভবিষ্যফলপ্রসূ হইবে। তিনি বলিবেন যে :—

১। ইতিহাস শিক্ষাদানের ফলে ছাত্রের স্মৃতি, কল্পনা এবং যুক্তি শক্তির বিকাশ হয়।

২। ইতিহাস অধ্যাপনা দ্বারা মানুষকে যুগ যুগান্তরের ধর্ম্ম ও নীতি ও দর্শন সম্বন্ধে সচেতন করা সম্ভব।

৩। ইতিহাস পড়ানর ফলে হৃদয়ে দেশপ্রেমের সঞ্চার হয়।

৪। ইতিহাস পঠন দ্বারা স্ব স্ব রাষ্ট্রের প্রতি ছাত্র শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়।

৫। ইতিহাস হইতেছে অতীতের রাজনীতির আকর। অতএব রাজনীতি শিখিবার জন্য আমরা ইতিহাস পড়াই।

এই সমস্ত যুক্তিই বিচারসহ।

স্মৃতি কল্পনা ইত্যাদিতো ইতিহাস না পড়িলেও সম্প্রসারিত হইতে পারে। অতএব ইহার জন্য ইতিহাসের অতিরিক্ত বোঝা তরুণ শিক্ষাথির উপর চাপাইবার প্রয়োজন কি? সাহিত্য কল্পনা সম্প্রসারণে সাহায্য করে—এবং গণিত ইতিহাস অপেক্ষাও যুক্তিজাল সম্প্রসারণে সহায়তা করে।

ইতিহাস কি সত্যই মানুষের ন্যায় এবং ধর্ম্মবোধকে জাগাইয়া তোলে? ইতিহাসের ঘটনাবলি কি সব সময় ন্যায়পরায়ণতার সহিত লিপিবদ্ধ হয়? ইতিহাসে কি আমরা এমন সব লোকের সাক্ষাৎ পাইনা যাঁহারা অনেক ক্ষেত্রে ন্যায়কে বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন বা এমন লোক কি জগতে বিরল যাহাদের কথা ইতিহাসে লেখা না হইলেও তাঁহারা মহাপুরুষ ছিলেন? অতএব ইতিহাসের মানুষের মনের এ অংশ বহন করার কাজকে আমরা প্রাধান্য দিতে পারি কি?

তৃতীয় প্রশ্নটি উঠিয়াছে—ইতিহাসদ্বারা দেশপ্রেম শিক্ষা দেওয়ার বিষয়ে। ইতিহাস কি সেজন্য শিক্ষা দেওয়া হইতে পারে? স্বদেশ প্রেম শিক্ষা দেওয়া ইতিহাসের কাজ নহে। ইতিহাসের কাজ হইতেছে নিরপেক্ষভাবে ঘটনাসমূহের পর্য্যালোচনা করিয়া যাওয়া মাত্র। ইহাতে যদি স্বদেশপ্রেম উদ্বুদ্ধ হয় ভালই; কিন্তু ইহা লক্ষ্যবস্তু হইতে পারে না।

চতুর্থ প্রসংগটিও ধোপে টিকে না কেননা ইতিহাসকে যদি রাষ্ট্রীয় নেতাদের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন করিবার উদ্দেশ্যে রচনা করা হয়—তবে তো ইতিহাস—ব্যক্তি বিশেষদের চরিত্রের প্রতি বা ঐতিহাসিক ঘটনা-সমূহের প্রতি সুবিচার করিতে পারিবেনা। ইতিহাস তখন যাহা লেখা হইবে তাহা হইবে পক্ষপাতদুষ্ট। ইতিহাসের উদ্দেশ্য কখনও তাহা হইতে পারে না। রাজনৈতিক মতবাদ তো সর্ব্বদা পরিবর্ত্তনশীল—ইতিহাস শাশ্বত এবং চিরদিনের অমর সাক্ষ্য।

অতীতের রাজনীতির আকর স্বরূপ ইতিহাস লেখা হাস্যকর। ইতিহাস রাজনীতির পুস্তক নহে। আধুনিক জগৎ মানুষকে সামাজিক জীবরূপে বাস করিতে বাধ্য করে। তাই যদি হয় তবে মানুষ কেবল রাজনীতিজ্ঞ হইবার শিক্ষা পাইলে চলিবে কেন?

অতএব আমরা ঘুরিয়া আবার সেই প্রশ্নেই আসি যে ইতিহাস শিক্ষাদানের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি?

ইতিহাস অধ্যাপনা করিতে গিয়া আমরা ইহার বহু মূল্য উপলব্ধি করি। কিন্তু যখন আমরা ইতিহাস পাঠ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করি—তখন এত শত মূল্যের বিষয় চিন্তা করি কি?

ইতিহাস পড়াইয়া কি লাভ হয়?

বাস্তব জগতে ইতিহাস পাঠের উপকারিতা কতটুকুন আছে? প্রতিদিন বিশ্বের শত সহস্র ইতিহাস শিক্ষকের অন্তঃকরণে এই প্রশ্ন, এই দ্বিধা, এই দ্বন্দ্ব জাগে। ব্রুচ প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ দৃঢ়তার সংগে বলেন, "ইতিহাস বড়দের পাঠ্য-বিষয় তাঁরা ইতিহাস পড়ে পাবেন প্রজ্ঞার সন্ধান, পাবেন পরমতসহিষ্ণুতার সন্ধান এবং গভীর সমালোচনার ইঙ্গিত।" কিন্তু তবুও বারবার এ প্রশ্নই মনে জাগে যে তবে কি তরুণ কিশোরদের ভার যে শিক্ষকদের উপর ন্যাস্ত তাঁহাদের কি ইতিহাস পড়াইয়া তরুণদের কচি নিষ্পাপ মনগুলিকে ঐ প্রকার গঠন করিবার প্রয়োজন নাই?

হাঁ তাহাদেরও পড়াইবার প্রয়োজন আছে বৈ কি!

ইতিহাস পঠন সম্পূর্ণ নূতন ধরণে গঠনোন্মুখ শিশুর মনের অন্য লোকের সম্বন্ধে কৌতূহল নিবৃত্ত করিতে পারে। শিশু ইতিহাস পড়িয়া অতীতের জীবনযাত্রা প্রণালী, তাহাদের কার্য্যাবলি, ভাবধারা প্রভৃতি সম্বন্ধে কৌতূহল নিবৃত্ত করিতে পারে, জ্ঞান অর্জ্জন করিতে পারে। ইহা—শিশুর মনে অতীত এবং বর্ত্তমান সমগ্র মানবতার সম্বন্ধে কল্পনাময় বিস্ময় এবং উত্তেজনার সৃষ্টি করিতে পারে।

ইতিহাস যুগও বংশপরম্পরা সমাগত এবং প্রাপ্ত বিভিন্ন যুগের এবং দেশের কৃষ্টি সম্বন্ধে একটি কৌতূহলময় পরিবেশ সৃষ্টি করিতে পারে এবং অন্যান্য দেশের সাহিত্য, শিল্পকলা এবং জীবনযাত্রা প্রণালী বিষয়ে একটি সুদৃঢ় জ্ঞানের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনা করে। বুদ্ধিবৃত্তির নিয়ন্ত্র ক্ষেত্রেও ইতিহাস বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ অংশ গ্রহণ করে, ইহা ছাত্রকে অভিব্যক্তি এবং বক্তব্য বিষয়ে যথাযথ হইতে সাহায্য করে। ঘটনাবলির যথাযথ মূল্য নির্দ্ধারণেরও সহায়ক হয়, নগণ্য হইতে সুগণ্যকে বাছাই করায় সাহায্য করে এবং মিথ্যার ও সত্যের তারতম্য নির্বাচনে সাহায্য করে।

ইতিহাস সমসাময়িক যুগকে অতীতের সমালোচনার পর্য্যায়ে টানিয়া আনে এবং অতীতের সহিত বর্তমানের তুলনায় মানুষ কি অবস্থায় আছে —তাহাও বুঝিভে পারে। অতীতের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অন্যান্য ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বর্ত্তমানের ঘটনাবলির সূত্র গঠনে তথা কর্ত্তব্য নির্দ্ধারনেও সাহায্য করে।

ইতিহাস অধ্যয়নের ফলে মানুষ বিতর্কমূলক বিষয়সমূহ হইতে সত্যকে বাছাই করার শক্তি অর্জ্জন করে—এবং স্বাধীন আলোচনায় উৎসাহ প্রাপ্ত হয় ফলে আপোষমূলক মনোবৃত্তি অর্জ্জন করে, যথাযথরূপে ইতিহাস শিক্ষাদ্বারা শিক্ষার্থিকে হৃদয়বান সমালোচক করিয়া গঠন করা হয়। কিন্তু ঠিক তেমনিভাবে কুশিক্ষার ফলে ইতিহাস শিক্ষার্থিকে অনুদার ও গোঁড়ামি সম্পন্ন করে। ইতিহাস পাঠ দ্বারা

শিক্ষার্থী—ভিন্ন ভিন্ন দেশের বড় যাঁরা, মহৎ যাঁরা, তাঁহাদের সম্বন্ধে—শ্রদ্ধাবান হয় এবং আন্তর্জ্জাতিক ঘটনার প্রতি তথা সমগ্র জগতের মঙ্গল এবং আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতির প্রতি আকৃষ্ট হয়। ইতিহাস পড়িতে পড়িতে শিক্ষার্থী বুঝিতে পারে—পরিবর্ত্তনই জগতের রীতি—এবং আমরা বর্ত্তমান পৃথিবীতে পূর্ব্বাপেক্ষা কতদূর অগ্রসর হইয়াছি এবং পূর্ব্ববর্ত্তিগণের গুণাবলির কতটা অংশ আমরা প্রাপ্ত হইবার সৌভাগ্য অর্জ্জণ করিয়াছি।

ইতিহাসের ঘটনাসমূহের যথাযথ অনুষ্ঠান সত্যেরই অনুসন্ধান। UneScoর এই বিষয় মত নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হইল।

"দলিল ইত্যাদি পরীক্ষান্তে স্থাপিত ইতিহাস—অতীতের জনসাধারণের কার্য্যাবলির বিবরণ। ইতিহাসের এই ভিত্তির প্রধান প্রধান সূত্রসমূহ শিশুদের অনভিগম্য নহে। ঘটনার সূত্র অনুসন্ধানের এই প্রচেষ্টাকে একদিকে ঐতিহাসিক সত্যের অনুধাবন বলা যাইতে পারে। অন্যদিকে ইহা ঐতিহাসিক ব্যাখ্যার সত্য-রীতিও বলা যায়। ঘটনা সমূহ পরিবর্ত্তন করা যায় না, কিন্তু তাহার ব্যাখ্যার ধারা পরিবর্ত্তন করা চলে—এবং পরিবর্ত্তিত করাও হয়। শিশুদিগকে যদি ঘটনাবলির বাহিক গতির জ্ঞান সম্বন্ধে সচেতন করা যায় এবং তৎসঙ্গে অবশ্যম্ভাবি বিষয় বস্তু সম্বন্ধে অবহিত করা যায় তাহা হইলে মূল্যবান শিক্ষা দেওয়া হইল বলা যায়। ইহার ফলে তাহারা ভবিষ্যতে প্রচার কার্য্যের জালে সহজে আবদ্ধ হইবে না।

"শিক্ষার্থীকে এই কথাই শিক্ষা দিতে হইবে যে মানুষ কিভাবে ধীরে ধীরে সমগ্র জগৎ তাহার আয়ত্তে আনে, এবং কিভাবে তার প্রয়োজন অনুসারে পরিবেশকে পরিবর্ত্তন করে—এবং এই পরিবর্ত্তন ও যুগান্তর কার্য্যে কি ভাবে সকল দেশ, জাতির অবদান রহিয়া গিয়াছে। উত্তরকাল কি ভাবে চিরদিনই অতীতের নিকট ঋণি—ইতিহাস—তাহারও শিক্ষা দেয়। ছাত্রদের এই—শিক্ষাই দেওয়া উচিত যে ইতিহাস খণ্ড খণ্ড ঘটনা বা গল্পের বিষয় বস্তু নহে—ইহা সমগ্র জগতের একটি

ঘটনা সমাবেশ। প্রসঙ্গক্রমে শিক্ষার্থীকে ইহাও শিক্ষা দেওয়া উচিত যে বিভিন্ন জাতি পৃথিবীতে কখনও পৃথক ভাবে বাস করে নাই। চিরদিনই জগতে চলিয়াছে ব্যবসা বাণিজ্য, কৃষ্টি, রাজনীতি, দর্শনের আদান প্রদান। শিক্ষকের কার্য্য হইতেছে এই সমস্ত সূত্র হইতে সন্ধান বাহির করিয়া ছাত্রের সম্মুখে ধরিয়া দেওয়া এবং ছাত্রের কাজ তাহার দেশ বিশ্বের অবদান ক্ষেত্রে কোন স্থান অধিকার করে তাহা নির্দ্ধারণ করা।"

অতীতে ইতিহাসে ছিল কেবল রাজা রাজন্যবর্গের যুদ্ধ ও ঘটনার সমাবেশ মাত্র। আধুনিক ইতিহাসে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোকেও বাহির করিয়া পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করে! যদিও এই সব বিষয়ে ইতিহাসের কার্য সবে সুরু হইয়াছে মাত্র বলা যায়। যদিও তরুণদের সমস্ত বিষয় গ্রহণ অপেক্ষাকৃত কঠিন মনে হয়, তবুও এইরূপ বলা যাইতে পারে যে বিভিন্ন কালে মানুষ কি প্রকারে খাদ্য ও বস্ত্রের জন্য সংগ্রাম করিয়াছে, কি ভাবে দেশে দেশে পরিভ্রমন করিয়াছে এবং কিভাবে যাতায়াতের পথের সন্ধান পাইয়াছে। এই সমস্ত ঘটনা কিশোরের নিকটই চিত্তাকর্ষক হইতে পারে। এই জ্ঞানের ভিত্তিই ভবিষ্যতে শিক্ষার্থীকে সমগ্র জগতের ইতিহাস অধ্যয়নে সাহায্য করিতে পারে।

মানসিক এবং নৈতিক চিন্তাধারা কিভাবে বিভিন্ন যুগে দেশে দেশে পরিবর্ত্তন আনিয়াছে তাহার অনুসরণও ইতিহাসের কাজ। গৌতম বুদ্ধদেবের ধর্ম্মপ্রচার, যীশুখৃস্টের ধর্ম্মপ্রচার, মহাম্মদের ধর্ম্মপ্রচার কিভাবে সমগ্র জগতে ছড়াইয়া পড়িল ইতিহাসে তাহা বিস্ময়ের সহিত দেখা যায়। এক যুগের সহিত অপর যুগের এক দেশের সহিত অপরদেশের এই ভাবেই বন্ধন গড়িয়া উঠে।

ইতিহাস ইহাও শিক্ষা দেয় যে পরমত অসহিষ্ণুতা এবং কুসংস্কার ও গোড়ামী দেশে দেশে আনিয়াছে বিদ্রোহ এবং সংস্কার। ইহাও পরিদৃষ্ট হয় যে কিভাবে কালক্রমে সহিষ্ণুতা, উদারতা শত্রুকেও

মিত্রতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছে। তরুণ কিশোররা অধ্যয়ন করিতে পারে, যুদ্ধে কি ভাবে দেশের বিপর্য্যয় অনিয়াছে এবং কেবল যুদ্ধরত দেশই নহে সমগ্র জগতের প্রভুত ক্ষতি সাধন করিয়াছে, যুদ্ধ কিভাবে শত সহস্র বৎসরের সঞ্চিত সাধনার কৃষ্টি ও সংস্কৃতির বিনাশ সাধন করিয়াছে।

তৃতীয় অধ্যায়

ইতিহাসের পাঠ্য সূচি

সুস্পষ্টরূপে ইতিহাসের কোনও আদর্শ পাঠ্য বিষয় (Syllabus) নাই। আমরা এথনে একটি আদর্শ পাঠ্য বিষয় কি কি হওয়া উচিত পর্য্যালোচনা করিব।

সর্ব্বপ্রথম লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে পঠনীয় বিষয় সমূহ সুপরিকল্পিত, সুসংলগ্ন এবং নির্দ্দিষ্ট হয়। শিক্ষার্থীদের কতগুলি এলোমেলো ঘটনা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় অধ্যাপনার কোনও সার্থকতাই নাই। বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ যেমন ক্রমশঃ স্তর হইতে স্তরে উন্নত হয় তেমনি পাঠনীয় বিষয় সমূহও স্তরে স্তরে নির্দ্দিষ্ট হওয়া উচিত। ছাত্রের ব্যক্তিগত উন্নতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বিদ্যালয়ের পাঠক্রম নির্ব্বাচিত হওয়া উচিত। বৃহৎ বৃহৎ বিদ্যালয় সমূহে যেখানে বহু শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করে সেখানে হয়তো বিভিন্ন ছাত্রের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য পাঠ্য বিষয় সমূহ বাছাই করিতে বিস্তৃততর গণ্ডীর প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন হইবে। স্থানীয় ইতিহাসকেও অবজ্ঞা করা চলেনা। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লী, শিল্পাঞ্চল, ঐতিহাসিক কেন্দ্র প্রভৃতির নিজস্ব স্থানীয় ইতিহাস থাকে। ইহার ভিত্তি হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রম বিকাশের পর্য্যালোচনা ও ইতিহাসের পঠনীয় বিষয়।

দ্বিতীয়তঃ পাঠ পরিকল্পনায় ইতিহাসের সহিত অন্যান্য পঠনীয় বিষয়ের সম্বন্ধ বা সংযোগ প্রভৃতিও লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। ইহার সার্থকতা এখানেই যে শিক্ষক বিভিন্ন বিষয়ের সংযোগ সূত্র স্থাপনাদ্বারা শিক্ষার্থীকে বুঝাইতে পারেন যে জ্ঞান বিভিন্ন বিষয়ের সংযোজক মূলক এবং সকল জ্ঞানেরই ভিত্তি একত্র গ্রথিত। ইতিহাসের সহিত ভূগোলের সংযোজনা দুরূহ কার্য্য নহে। শিক্ষক জানেন ইহা প্রয়োজনও হয়। সাহিত্যের সহিত ইতিহাসের সংযোগ স্থাপনও কষ্টকর নহে। সিরাজউদ্দৌল্লার ইতিহাস পড়াইতে গিয়া অক্ষয় মৈত্র মহাশয়ের পুস্তক, পলাশীর যুদ্ধ পড়াইতে

গিয়া নবীন সেন মহাশয়ের কাব্য বা পৃথ্বীরাজ পড়াইতে গিয়া যোগীন বাবুর কাব্যের সংঙ্গে সংযোগ স্থাপন পাঠ্য বিষয়কে চিত্তাকর্ষকই করে। ইতিহাসের সহিত বিজ্ঞান ও গণিতের তেমন সম্পর্ক বা সংযোগ নাই বলিয়াই আমরা সাধারণ ধারণা পরিপোষণ করি। কিন্তু বিজ্ঞানেরও ইতিহাস আছে বা গণিতিক বিকাশেরও ইতিহাস আছে। তাহার সহিত ইতিহাসের সংযোগ স্থাপন করা কষ্টকর নহে। খনা, লীলাবতী ইউক্লিড, আর্য্যভট্ট প্রভৃতির সহিত গণিত সম্বন্ধ, কিন্তু ইহাদেরও ইতিহাস আছে বৈ কি। আমরা ইতিহাস পড়াইতে গিয়া কলম্বাসের আবিষ্কারের সহিত জগতের পরিবর্ত্তন, ব্যবসা বানিজ্যের ইতিহাস, ঔষধ তত্ত্বের বিবরণ, ভৌগোলিক আবিষ্কার প্রভৃতির সহিত স্বচ্ছন্দে সংযোগ স্থাপন করিতে পারি। ইহার ফলে শিক্ষার্থীর মনে ইতিহাসের প্রকৃত এবং বিস্তৃততর গণ্ডীর সম্বন্ধে সুস্পষ্টতর ধারণা বদ্ধমূল করা যায়।

গণ্ডীর প্রসঙ্গে সীমার প্রশ্নও আসিয়া পড়ে। বাস্তবিক পক্ষে বিদ্যালয়ে ইতিহাসের পাঠ সূচি কতখানি স্থান অধিকার করিতে পারে? আমাদের ভারতবর্ষের শতকরা ৮০ জনই বোধ হয় প্রাথমিক শিক্ষার উচ্চস্তরে পৌঁছাইতে বর্ত্তমান অবস্থায় পারেনা। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে হয়তো যায় ১৫ জন আর বাকি ৫ জন যায় উচ্চতর অধ্যয়নে। ইহাও নিতান্ত আশাবাদীরই কথা। তাহা হইলে অবস্থা দাঁড়াইল আমাদের দেশের দশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বেশীর ভাগ ছেলে ইতিহাস পড়িবার সুযোগ পায় অতি সামান্যই। প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহে কতটুকু পড়াইতে পারে? ছেলেদের এই সময়ে বর্ণ পরিচয়, সাহিত্যের কথা হৃদয়ঙ্গম করিতে করিতে কত সময় কাটিয়া যায়? কেবল মাত্র তৃতীয় বা চতুর্থ শ্রেণীতে কতটুকু জ্ঞানই বা দেওয়া যায় ইতিহাস সম্বন্ধে? তারপর মাধ্যমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে আসিলে দেখা যায় যে সেখানেও বিভিন্ন বিষয়ের চাপ এত বেশী যে সপ্তাহে দুইদিন বা তিনদিনের বেশী আমরা ইতিহাসকে স্থান দিতে পারি না। ইহার মধ্যে কতটুকু ইতিহাসের বিষয় পড়ান যায়— আর এ অধ্যয়নের সুযোগই বা কয়জন পাইবে? কাজের তারতম্য

অনুসারে পাঠ্য স্থচি নির্দ্ধারণ করা কষ্টকর। ইতিহাসের পাঠ্য প্রথম হইতে অর্থাৎ অতীত কাল হইতে আরম্ভ করিয়া যদি প্রাথমিক বিদ্যালয় আরম্ভ করা যায় —এবং যুগের স্তর অনুসারে যদি উচ্চতর শ্রেনীতে আসা যায়—তাহা হইলে দেখা যায় যে প্রাথমিক পর্য্যায়ে—পাঠ্যস্থচি অপেক্ষাকৃত কঠিন হইয়া পড়ে কেননা—প্রাচীনকালের ইতিহাসইতো কঠিন। আবার যদি বর্ত্তমান কাল হইতে নিম্ন শ্রেনীতে আরম্ভ করা যায়—তাহা হইলে শিক্ষার্থীরা ক্রমবিকাশের ধারাকে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইবে না। অতএব ইতিহাসের পাঠ্যস্থচি নির্দ্ধারণ করা কষ্টকর কাজই হইয়া পড়ে।

এই মুস্কিল আসান হইবার উপায় কি?

কোন কোনও শিক্ষাবিদ্ মনে করেন যে শিশু ভবিষ্যতে এই পৃথিবীতেই বাস করিবে, চলাফেরা করিবে। অতএব অতীতের ইতিহাস যাহা পৃথিবীকে বর্ত্তমান রূপ দিয়াছে এবং ভবিষ্যতের রূপও দিবে তাহাইতো পড়া উচিত। তাহা হইলে দেখা যায় সমগ্র জগতের এবং অতীতের বিষয় জানা প্রয়োজন। আমাদের দেশে পূর্ব্বে বিদ্যালয়সমূহে যে ইতিহাস পাঠ্যস্থচি ছিল তাহার সহিত জগতের ইতিহাসের কোনও সম্পর্ক ছিল না। তারপর আই. এ. বা বি. এ. পরীক্ষারও যে পাঠ্যস্থচি ছিল বা এখনও আছে—তাহাতে কি দেখা যায়? কেবল একটা বিশেষ অংশের বা যুগের ইতিহাস মাত্র ছাত্রগণ অধ্যয়ন করে।

নিম্নে ইতিহাসের পাঠ্যস্থচি কি প্রকার হওয়া উচিত তাহার একটি পর্য্যালোচনা করা যাইতেছে। ইহা অভ্রান্ত নহে বরং যুক্তিসাপেক্ষ।

(ক) জীবরূপে মানবের উৎপত্তি হইতে বর্ত্তমান জগৎ পর্য্যন্ত পৃথিবীর ইতিহাস। বয়সের তারতম্য অনুসারে ইহা স্থচিরূপে নির্দ্ধারণ কষ্টকর—ইহাতে সন্দেহ নাই—কিন্তু ইহার বিশেষ স্থবিধা এই যে শিক্ষার্থীগণ মানব জাতির মূল একত্রতা এবং কি ভাবে কালে কালে পরস্পর পরস্পর হইতে তফাৎ হইয়া পড়িল—তাহার পথকে স্থস্পষ্ট ধারণা করিতে পারিবে।

(খ) জাতীয় ইতিহাস। প্রত্যেক ইতিহাস পাঠ্যসূচির ইহা অন্তর্নিহিত লক্ষ্য হওয়া লচিত। হয়তো অনেকে ইহাতে ক্ষুদ্রতার সন্ধান পাইবেন এবং বলিবেন বিভিন্ন জাতির বৃদ্ধিই ইতিহাসরূপে পড়ান উচিত।

(গ) স্থানীয় ইতিহাস—শিশুদের পাঠক্রমে ইহা একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ। শিশুরা স্থানীয় বিবরণীসমূহ কৌতূহলাক্রান্ত হৃদয়ে শ্রবণে উৎসুক হয়। ইহা উহাদের কল্পনাজাল বিস্তারে সহায়ক হয়—এবং ইতিহাসের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন করিয়া মনকে গঠন করে।

(ঘ) সামাজিক অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক ইতিহাস। সাধারণতঃ রাজাদের কাহিনী ও যুদ্ধবিবরণী পড়িতে পড়িতে মন ভারাক্রান্ত হইয়া পড়ে। তখন মন হইয়া উঠে বৈচিত্র্যোন্মুখ। এ অবস্থায় সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সংস্কৃতির বিবরণীসমূহ চিত্তাকর্ষক ও হৃদয়গ্রাহীও হয় এবং স্বল্পপরিসর গণ্ডীর মধ্যে নিজস্ব চিন্তার ধারা তথা গবেষণারও সুযোগ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভারতের মৌর্য্যযুগের বা গুপ্ত যুগের কৃষ্টিধারার ইতিহাস অনুসরণ করিতে গিয়া শিক্ষার্থীগণ বিভিন্ন দেশের পরস্পরের সংযোগশীল কৃষ্টির সূত্রের সন্ধান পায়।

(ঙ) সমসাময়িক ইতিহাস বা আধুনিক ঘটনাবলি। এই সম্বন্ধে শিক্ষকগণের মধ্যে পরস্পর বিরোধি মত দেখা যায়। একদল বলেন আধুনিক ইতিহাস—"সেদিনের ঘটনা——এই সমস্ত ইতিহাসের পর্য্যায়ে আনার কি প্রয়োজন?" অপর দল বলেন, "তা কেন? বর্ত্তমান ও অতীত পরস্পর সমসূত্রে গ্রথিত। অপেক্ষাকৃত বয়স্কদের বর্ত্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে অতীতকে অধ্যয়ন করা নিঃসন্দেহে সত্যিকার ইতিহাস বিচারবুদ্ধি প্রসারের সহায়ক হয়।"

(চ) দূরবর্ত্তি অঞ্চলসমূহের ইতিহাস।

(ছ) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশ সমূহের ইতিহাস।

এখন প্রশ্ন দাঁড়ায় পাঠ্যবিষয় সমূহ কি প্রকারে সন্নিবেশিত করিতে হইবে। Stanley Hall এর বিখ্যাত মনস্তাত্বিক সন্নিবেশ এর নাম

শিক্ষাক্ষেত্র Culture epoch theory নামে পরিচিত। তাঁহার মতে প্রত্যেক বালক তাহার জীবনের প্রতিপদে মানবজীবনের ক্রমবিবর্ত্তনবাদ বা বিকাশের পদাঙ্কই অনুসরণ করে। মানুষ প্রথম বন্য অবস্থায় যে ভাবে চলাফেরা করিত, জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিত, যাযাবরের ন্যায় পরিভ্রমণ করিত, প্রত্যেক শিশুই অজ্ঞাতসারে তাহারই অনুসরণ করিতে ভালবাসে। শিশুর হামাগুড়ি দেওয়া, জিনিষপত্র নষ্ট করা, স্বার্থপর প্রবৃত্তি সেই আদিম মনের মানবজীবনের অনুকরণ এই কথাই যদি আমরা মানিয়া নেই তাহা হইলে ইতিহাসের আদিমযুগশিশুদের পাঠ্য, মধ্যযুগ—তরুণ কিশোর কিশোরিদের এবং আধুনিক যুগ উচ্চতর বিদ্যালয় শ্রেণীসমূহের এবং কলেজের জন্য।

কিন্তু এই Culture Epoch মতবাদ বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত নহে। শিশু কি বাস্তবিক বন্য? তাহার অন্তর্নিহিত বহু সদগুন বাল্যেই বিকশিত দেখিতে পাওয়া যাইতে পারে। বন্য বা অসভ্য অবস্থায় মানুষের এই সদগুণের সন্ধান পাওয়া যাইতনা। ইহা ছাড়াও আরও কয়েকটি বিষয় চিন্তা করিবার আছে। সমস্ত জাতি এক বিবর্ত্তনবাদ অনুসারে চলে না। বাল্যকালের সহিত হয়তো এই Culture Epoch বাদের কিছু সাদৃশ্য মিলিলেও মিলিতে পারে। কিন্তু তরুণ কিশোর বয়সের সহিতও কি জগতের আদি তরুণ কিশোর বিবর্ত্তন অবস্থার সহিত সাদৃশ্য খুঁজিয়া পাইবে? তবুও এই মতবাদ ইতিহাস শিক্ষাবিষয় রচনায় শিক্ষককে প্রভূত সাহায্য করিয়াছে।

এই মতবাদ সুধীগণকে এই চিন্তা যোগাইয়াছে যে প্রকৃতপক্ষে ইতিহাসের পাঠ্যবিষয়ের মধ্যে এবং শিক্ষাপ্রণালীতে কিছু কর্ম্মকেন্দ্রিক শিক্ষার প্রবেশ প্রয়োজন।

এই মতবাদ আমাদিগকে শিশুর ইতিহাস পড়ানর মধ্যে কল্পনা-শক্তিরও বিকাশের সুযোগ প্রদানের সহায়তা করিয়াছে।

এই মত অনুসারেই ইতিহাস পড়ানর পশ্চাতে নৃতত্ব প্রভৃতির (প্রবর্ত্তন) প্রয়োজনীয়তার উপলব্ধি জন্মাইয়াছে।

এই সমস্তই ইতিহাসের অধ্যাপনার মনস্তাত্বিক দিক। ইতিহাসের আর একটি দিক হইতেছে জীবন বৃত্তান্তমূলক।

এই মতবাদ অনুসারে শিশু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আখ্যায়িকাসম্বলিত জীবন কাহিনী শুনিতে ভালবাসে। ইতিহাসের ঘটনা সমূহ এই পরিপ্রেক্ষিতে তাহাদের নিকট উপস্থিত করা উচিত। ব্যক্তিগত কাহিনীরই প্রাধান্য দেওয়া উচিত।

মনীষি কার্লাইল এই প্রধান ব্যক্তির মতবাদের পৃষ্ঠপোষক। তাঁহার মতে একটা জাতির ইতিহাস কি? ইহা বিভিন্ন যুগের প্রধান ব্যক্তিদেরই ইতিহাস। আমাদের গীতায়ও আছে যে ধর্ম্মের গ্লানি দেখা দিলে একজন পরমপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন। আমরা জানি তখন সে দেশের ইতিহাস প্রধান পুরুষের কার্য্যাবলীরই ইতিহাস হইয়া দাঁড়ায়। ভারতবর্ষের ইতিহাসে আমরা চন্দ্রগুপ্তমৌর্য্য, হর্ষবর্দ্ধন, শিবাজী, আকবর, ঔরঙ্গজেবের কাহিনীর মধ্যে তাঁহাদের স্ব স্ব কার্য্যাবলিই প্রধান দেখিতে পাই। গণের ইতিহাস যেন তাহার মধ্যে চাপা পড়িয়া গিয়াছে। ইংলণ্ডের ইতিহাসেও সাইমন ডি মণ্টফোর্ড, ক্রমওয়েল, গ্লাডষ্টোন, পিট প্রভৃতির ইতিহাসই কি গণকে নিয়ন্ত্রন করে নাই? নেতারাই তো সমগ্র দেশে তাঁহাদের কার্য্যাবলী, তাহাদের জীবন কাহিনীইতো দেশের ইতিহাস। অতএব জীবনবৃত্তান্তবাদ মতকে আমরা মানিয়া লইব না কেন?

এই মতবাদও খণ্ডনীয়।

ইহাতে গণতান্ত্রিক রীতি অনুসরণ করা হয়না। সমাজের জীবনকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করা হইল।

ব্যক্তিশ্রেষ্ঠগণতো তাঁহাদের যুগের সকলের প্রতীক নহেন। তাঁহারা উন্নত শীর্ষে অবস্থান করেন—তাহাদের জীবন হইতে নিম্নস্তরকেও কি অধ্যয়ন করা চলে?

ইহাও লক্ষ্য করা গিয়াছে যে শ্রেষ্ঠপুরুষগণ হয়তো সামাজিক জীবনের একদিকে প্রধান—অন্যান্য দিক অবজ্ঞাত পড়িয়া থাকে। সমাজ বা জাতির সেই সমগ্র দিক তাঁহাদের জীবন হইতে জানা যায়না।

মনীষিরা বা নেতারা একাদিক্রমে দেশে দেশে যুগে যুগে দেখা দেননা। তাঁহাদের জীবনে ইতিহাসের ক্রমধারার সন্ধান দিতে পারেন না।

যাহারা উল্লিখিত মতবাদকে খণ্ডন করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা বলেন, "বেশ, ব্যক্তি বিশেষের জীবনকাহিনীর উপর নির্ভর না করিয়া তাঁহার যুগের, বা আরও অধিক ব্যক্তির জীবন কাহিনী সম্বলিত ইতিহাস রচিত হউক। তাহা হইলেই—এই অভাবও দূর হইবে। জীবন কাহিনী রচনা করিতে গিয়া—আমরা গল্পকে প্রাধান্য দিবনা এই কথা যেন সর্ব্বদা স্মরণ থাকে। গল্পের মধ্যে ইতিহাসের শিক্ষা না থাকিলে—তাহা ইতিহাসের পর্য্যায়ে আসেনা।

জীবনকাহিনীদ্বারাও মূল্যবান ইতিহাস রচনা করা যায়—অ্যাবট কর্ত্তৃক নেপোলিয়ান বোনাপার্টির জীবন কাহিনী—প্রকৃতপক্ষে একটি মূল্যবান ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত।

বিশ্ববিদ্যালয় জীবনেও জীবনকাহিনী ইতিহাস শিক্ষাপ্রদানে প্রভূত সাহায্য করে।

ইতিহাসের শিক্ষক নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়াছেন যে যখন শিক্ষার্থীগণ একঘেয়ে সমাজের বা যুদ্ধের বর্ণনায় ক্লান্ত হইয়া পড়ে—তখন জীবন কাহিনীর বর্ণনা মনোজ্ঞরূপে ছাত্রছাত্রিদের আকৃষ্ট করে।

অতএব ইতিহাসের শিক্ষাবিষয় নির্দ্ধারণ যত সহজ মনে হয় তত সহজ নহে। ইতিহাসকে চিত্তাকর্ষক করিবার জন্য আমরা—ইচ্ছা করিলে কাগজের ক্রম পরিবর্ত্তনের ইতিহাস, প্রাচীন জীবন-যাত্রার পালতোলা নৌকা হইতে বর্ত্তমান জাহাজে পরিণতির ইতিহাস, এমন কি কলমের, ঝর্ণা কলমেরও ইতিহাসের ধারা অনুসরণ করিতে পারি।

বিষয় সূচি নির্দ্ধারণে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ লক্ষ্য রাখা উচিত।

(ক) প্রথমতঃ ইতিহাসের একটি বিশেষ বিষয় ঠিক করিয়া তাহাকে কেন্দ্র করিয়া ইতিহাসের পাঠ্যসূচি অনুসরণ করিলে ভাল হয়।

(খ) মানুষের ক্রমবিকাশ ও উন্নতির ইতিহাস যাহাতে জ্ঞাত হওয়া যায় এমন ধারা অনুসারে ইতিহাসের পাঠ্যসূচি নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে।

(গ) সময়ানুক্রমিক ধারা যাহাতে অনুসরণ করা যায়—এমন পাঠ্যসূচি বাছাই করা উচিত।

(ঘ) এমন ভাবে বিষয় সমূহ বাছাই করা উচিত যাহাতে শিশুগণ তাহাদের যুগের সমগ্রজগতের পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়ের দরজায় পৌছিতে পারে এবং তাহার সম্বন্ধ বিবেচনা করিতে পারে।

আমরা জানি বর্ত্তমানে আমাদের বাংলাদেশে কিশোরদের জন্য যে বিদ্যালয় পাঠ্যসূচি নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে—তাহাতে ক্রমানুক্রমিক বিবরণ যেমন একদিকে তেমনি অপর দিকে সমস্ত পৃথিবীর ইতিহাসকে গ্রথিত করা—হইয়াছে সময়ানুক্রমেও।

শিক্ষক মাত্রই জানেন এই সমস্ত বিষয়ে বহু আলোচনা হইয়া গিয়াছে।

চতুর্থ অধ্যায়

পাঠ্যসূচির সন্নিবেশ

পাঠসূচি সম্বন্ধে বহু আলোচনা হইল। যুগ এবং প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে বিষয় নির্দ্ধারণ করা উচিত—ইহাই যদি আমরা মানিয়া লই তবে আমাদের সম্মুখে এখন প্রশ্ন দাঁড়ায়—আমরা কোন প্রণালীতে পঠনীয় বিষয়সমুহ সন্নিবেশিত করিব।

ইতিহাসের শিক্ষকগণ জানেন যে এই বিষয়ে তুইটি প্রধান মত আছে।

কেন্দ্রীভূত প্রথা—একদল বলেন বিষয়টিকে কেন্দ্রীভূত করিয়া—বৎসরের পর বৎসর মূল বিষয়কে কেন্দ্ররূপে রাখিয়া ইতিহাসের বিষয়-সমূহের দিকে অগ্রসর হওয়া। এই চিন্তাধারার অনুসরণকারীদের মতে নিম্নশ্রেণীতে যে বিষয়টি পড়ান হইল—তাহাকেই কেন্দ্র করিয়া ক্রমশঃ উচ্চতর শ্রেণীতে ঐ বিষয়েরই বিস্তৃত পাঠক্রম অনুসরণ করা উচিত। সর্ব্বনিম্নশ্রেণীতে কেবলমাত্র একটি রেখাসূত্র স্বরূপ বিরাট ইতিহাসের সূত্র ধরিয়া—রাখিয়া ক্রমশঃ উচ্চতর শ্রেণীতে উহার প্রসারতার দিকে চলিয়া যাওয়া। একই ক্ষেত্রে বার বার পাদচারণা করিয়া বা পদভিত্তি স্থাপন করিয়া—বিস্তৃততর ক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়াই ইহাদের মত।

সময়ানুক্রমিক এই মতবাদ যাঁহারা প্রচার করেন তাঁহারা বলেন, বিভিন্ন যুগ অনুসারে বিভিন্ন শ্রেণী অথবা বয়সের পাঠ্যসূচি হওয়া বাঞ্ছনীয়। এই প্রকার সময়ানুক্রমিক বিভাগের জন্য ইহাকে Periodic ও বলা হয়। এই মতবাদীগণ Culture Epoch মতবাদের কতকটা সমর্থক।

আমরা উভয় মতই বিচার্য্য মনে করি।

প্রথম মতটির প্রতিকূলে যুক্তি দেখান হয়।

(ক) সমস্ত বিষয় সংক্ষেপে পড়াইতে গিয়া ইতিহাস শিক্ষাদাতা প্রকৃত ইতিহাস শিক্ষা দান করিতে পারেন না। তিনি কেবল কতগুলি সামান্য রেখার সহিত প্রতি বৎসর পরিচয় করাইতে পারেন।

(খ) প্রতি বৎসর একই বিষয় অধ্যয়ন করিতে করিতে শিক্ষার্থীগণ বিষয়ের মাধুর্য্য হারাইয়া ফেলে এবং পাঠ্য বিষয় একঘেয়ে নীরস হইয়া দাঁড়ায়।

(গ) অত্যল্পকালের মধ্যে ইতিহাসের পাঠ্যটি পড়াইতে হইবে বলিয়া শিক্ষক বিশেষ ভাবে চেষ্টা করিলেও ছাত্রগণ সময় বা যুগ রেখার তারতম্য সুষ্ঠরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেনা।

উল্লিখিত যুক্তিসমূহও খণ্ডনীয়। একই বিষয় বারংবার পড়ান হইলেও—কিন্তু ক্রমশঃ বিস্তৃততর পন্থায় অগ্রসর হইলে একঘেয়েমি হইতে পারে না—বর্ণনা চিত্তাকর্ষক হইলে নূতন নূতন বিষয়ের সন্ধান মিলিবে বৈ কি।

এইবার দ্বিতীয় মতটির পরীক্ষা হউক।

(ক) শিক্ষার্থীগণ পুনরালোচনা না হইলে পঠিত বিষয় সমূহ বিস্মৃত হইতে পারে।

(খ) প্রাকযুগের বিস্তৃত ইতিহাস পড়িবার সুযোগ শিক্ষার্থীগণ আর পাইবেনা কেননা তাহারা তো অতি অল্পবয়সে খুব সংক্ষেপে বিষয়সমূহ অধ্যয়ন করিতেছে মাত্র।

উভয় মতবাদের সমন্বয় সাধন করিয়া আমরা যদি আমাদের ইতিহাসের পাঠ্যসূচি শিক্ষার্থীদের নিকট—উপস্থিত করিতে পারি, তবেই বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পন্থা অনুসরণ করা হয়।

আমাদের বর্ত্তমান বিদ্যালয় সমূহে যে পাঠ্যসূচির বন্দোবস্ত করা হইয়াছে তাহা মনে হয় উভয়ের সমন্বয়েই সন্নিবেশিত।

নির্দ্দিষ্ট বিষয় ক্রম

এই নীতি অনুসারে এক একটি নির্দ্দিষ্ট বিষয় স্থির করিয়া শিক্ষার্থীদের সম্মুখে উপস্থাপিত করা হয়। ইতিহাসের পাঠক্রম এই সমস্ত ক্ষেত্রে বিষয় অনুসারে নির্দ্ধারিত হয়। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস, বা ইংলণ্ডের শিল্পবিপ্লবের ইতিহাস এইভাবে বিষয়টিতে অগ্রসর হওয়া যায়। এই ধরণের পাঠক্রম উচ্চশ্রেণীর উপযুক্ত—নিম্ন শ্রেণীর জন্য নহে।

প্রত্যাবর্ত্তনশীল বা প্রতিগামী পন্থা

এইপন্থা অনুসারে জ্ঞাত বিষয় হইতে অজ্ঞাত বিষয়ে অগ্রসর হয়। এই মতবাদ পরিচিতি হইতে অপরিচিতির মধ্যে প্রবেশ করে। শিশুদের নিকট ইহা কার্য্যকর হয়। ইহার আর একটি অসুবিধা এই শিক্ষকগণ প্রথমে বর্ত্তমানের উল্লেখ করার পর একবার পশ্চাদপসরণ করিলে—আবার সেই অতীতেই থাকেন। মধ্যযুগের সহিত আর সংযোগমূলক অধ্যাপনার সূত্র স্থাপন করেন না।

অনেকের মতে শিক্ষকের উচিত বর্ত্তমানের উল্লেখ পূর্ব্বক অতীত এবং মধ্য যুগের সহিত তাহার সংযোগ স্থাপন করা—এবং বারংবার সে পথে বিচরণ করা। ইহাকে দোদুল্যমাননীতি পন্থা বলা যায়।

ইতিহাস শিক্ষকের পক্ষে যাহাদের সম্বন্ধে বর্ণনা হইতেছে তাহাদের বিষয়ে গভীর জ্ঞান, গভীর সহানুভূতি এবং গভীর প্রীতি থাকা প্রয়োজন। এই প্রকারেই শিক্ষক ছাত্রদের নিকট পঠনীয় বিষয় চিত্তাকর্ষক করিতে পারেন। অতীতের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন না হইলে ঐ সমস্ত বোধ জন্মে না। অতএব কেহ যদি মনে করেন যে নিম্নশ্রেণীর ইতিহাস শিক্ষকের খুব বেশী জ্ঞান থাকা প্রয়োজন হয় না তবে তিনি খুব ভুল করিবেন।

এই শিক্ষককে সুদক্ষ অভিনেতাও হওয়া প্রয়োজন। বর্ণনাভঙ্গি

তাঁহার বৈচিত্র্যময় হইবে এবং তাহা সম্ভব হয় তখনই যদি শিক্ষক অভিনয়নিপুণ হন। সময় সময় তাঁহার স্বরকে উচ্চগ্রামে বা নিম্নগ্রামে লওয়া প্রয়োজন হয়। যদি শিক্ষক বর্ণনানিপুণ না হন, তাহা হইলে তিনি পুস্তক হইতে যথাযথ যতিবিরতি লক্ষ্য রাখিয়া শব্দবিন্যাসের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ছাত্রদের নিকট পাঠ্য বিষয়টি পড়িয়া শুনাইবেন।

ব্লাকবোর্ডের কাজ অনেকে মনে করেন আনুসঙ্গিক হইলে ভাল হয়—আবার কেহ কেহ বলেন পঠনদান শেষ হইলে ভাল হয়। যাঁহারা আনুসঙ্গিকের পক্ষপাতি তাঁহারা বলেন—বর্ণনা নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষক কঠিন নামগুলি বা গ্রহণযোগ্য শব্দগুলি বা সংক্ষেপমূলক ইঙ্গিত-গুলি বোর্ডে লিখিয়া যাইবেন। ইহাতে ছাত্র আনন্দ পাইবে, বৈচিত্র্য পাইবে এবং সহজে স্মরণ রাখিবে। যাঁহারা পরে সংক্ষিপ্তসার দেওয়ার অনুকূলে, তাঁহারা বলেন—ইহাতে সমস্ত বিষয় পড়িতে হইলে—একবার মাত্র দেখিয়া বিষয়টি স্মরণ করিতে পারিবে। ছাত্রগণ ইচ্ছা করিলে ইহা খাতায় টুকিয়া নিতে পারে।

সুবিধা হইলে শিক্ষকগণ অন্য একটি বোর্ডে চিত্রাঙ্কন প্রভৃতি দেখাইয়া পাঠকে মনোরম করিতে পারেন।

অতীতের ইতিহাসকে শিক্ষার্থীদের নিকট জীবন্তরূপে দেখাইতে হইলে মডেল অথবা প্রতীক কিছু দেখান দরকার। শিক্ষকের পক্ষে ইহা প্রস্তুত করা সম্ভবপর হয় না। ভারতবর্ষের কোনও প্রতিষ্ঠান যদি এই ঐতিহাসিক মডেল প্রভৃতি নির্ম্মাণের ভার গ্রহণ করে তবে ভাল হয়।

ছবিও শিক্ষাকে প্রাণময় করে। শিশুরা যেমন গল্প শুনিতে ভালবাসে তেমনি ছবিও দেখিতে ভালবাসে। প্রাচীন বা মধ্য যুগের সামাজিক উৎসবের বা পারিবারিক ছবি শিক্ষক উপস্থিত করিতে পারেন।

ছবি অনেকগুলি যেমন দেখান ভাল নয় তেমনি দ্রুতগতিতে কোনও প্রকারে বেগার শোধ দেওয়াও উচিত নয়।

পঞ্চম অধ্যায়

ইতিহাস শিক্ষাদান প্রণালী এবং শিক্ষোপকরণসমূহ

"ইতিহাস পড়ান—সে তো খুব সহজ কথা" ঐ ধারণা আমাদের দেশের অনেক শিক্ষিত লোকের মনেই আছে। কিন্তু প্রকৃত ইতিহাস যিনি জানেন তিনি জানেন কর্ম্মক্ষেত্রে বাস্তবের সম্মুখে ইতিহাস শিক্ষাদান কি প্রকার কষ্টকর।

শিক্ষার্থীগণ জানে বা ভাবে যে কতগুলি সন তারিখ স্মরণ রাখার বাস্তব সার্থকতা কোথায়ও নাই। ইতিহাস একটি নীরস বিষয় এবং কেবল মুখস্থ করাই ইহার কাজ।

শিক্ষকও হয়তো এই সঙ্গে যোগ করিবেন যে গভীর এবং দীর্ঘস্থায়ী জ্ঞানসূত্র হিসাবে ইতিহাসকে শিক্ষার্থির মনে স্থাপন করা কষ্টকর। ইহা অপরিণত বয়সে পড়ার ফলে হয় কেবলমাত্র স্মৃতিবিজড়িত চর্চ্চা। ইহা অপেক্ষাকৃত স্থিরবুদ্ধিসম্পন্ন বয়সের বিষয়।

তবেই প্রশ্ন দাঁড়ায় ইতিহাসকে মূল্যবান বিষয়রূপে আমরা কি প্রণালীতে শিক্ষার্থীর নিকট উপস্থাপিত করিতে পারি অর্থাৎ শিক্ষা প্রণালীটি কি হইবে।

শিক্ষাপ্রণালী নির্ভর করে শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব, তাঁহার বর্ণনাভঙ্গিমা, তাঁহার চিত্তাকর্ষণীয় ক্ষমতার উপর। শিক্ষক যদি দেখেন যে তাঁহার বর্ণণাতে শিক্ষার্থীদের হাইতোলা আরম্ভ হইয়াছে—তখনই তাহাকে ধারা পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে। শিক্ষক হইবেন সুদক্ষ ধনুর্দ্ধর—তাঁহার গাণ্ডীবে থাকিবে—বিভিন্ন প্রকারের তীরস্বরূপ পন্থা। তিনি যে তীরটি—সুতীক্ষ্ন মনে করিবেন সেটিই প্রয়োগ করিবেন। শিক্ষার্থীগণ, বিশেষভাবে শিশুগণ, একঘেয়ে শিক্ষাপ্রণালী পছন্দ করে না।

তবুও ইতিহাস শিশুর চিত্তাকর্ষক করিবার কয়েকটি পন্থা আলোচনা করা যাইতেছে।

শিশুরা স্ব স্ব পরিবেশ পরিচিত গণ্ডীর মধ্যে—ইতিহাসের যেটুকু গন্ধ পায়—সেটুকু গভীর আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করে। শিশুর দৃষ্টি নিজস্ব গণ্ডীর মধ্যে স্থানীয় ঐতিহাসিক উদ্যান, কামান, মঠ, প্রাসাদ প্রভৃতির প্রতি আকৃষ্ট করিলে তাহা সুফলপ্রসূ হয়।

শিশুকে শিক্ষাদান প্রসঙ্গে আর একটি মহাসত্য তাহাকে কর্ম্মকেন্দ্রিক শিক্ষাপ্রদান। শিশুরা নিজস্ব কাজ দেখাইবার জন্য উদগ্র হইয়া থাকে। ইতিহাস শিক্ষক যখন একঘেয়েমি বক্তৃতার পর বক্তৃতা দিয়া যান, তখন তিনি এই সমস্ত বিষয় চিন্তা করেন না। যিনি করেন, তিনি শিশুকে সুযোগও দেন। শিশুরা ঐতিহাসিক নাটক অভিনয় করিতে পারে, তাহারা স্ব স্ব হাতের কাজ দ্বারা ইতিহাসের ঘটনাসমূহ প্রত্যক্ষরূপে দেখাইতে পারে। তাহারা আরও অনেক কিছু করিতে পারে। শিক্ষকের সমস্যা এই—বৈজ্ঞানিক শিশুকে দিয়া যেমন তাঁহার বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি দ্বারা শিশুর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা জন্মাইতে পারেন, রসায়ণবিদ তাঁহার রসায়ণের সাহায্যে শিশুর কৌতূহল চরিতার্থ করিতে পারেন, ভৌগোলিক তাঁহার মানচিত্র দ্বারা শিশুর শিক্ষার আকাঙ্ক্ষার পূর্ণতা প্রদান করিতে পারেন—কিন্তু ইতিহাস শিক্ষক কি করিতে পারেন? তাঁহার যে কোনও যন্ত্রপাতি বা সাজসরঞ্জামই নাই। ইহা কি প্রকৃত সত্য? ইতিহাস শিক্ষকের হাতে কি সত্যিই কোনও যন্ত্র নাই? তিনি শিক্ষার্থিদের নিকট ঐতিহাসিক মুদ্রা, প্রাচীন সৌধ ইত্যাদি উপস্থাপিত করিতে পারেন না? তিনি কি ছাত্রদের দ্বারা ঐতিহাসিক অভিনয়, পুতুল গড়া প্রভৃতি দ্বারা শিক্ষাকে প্রাণবন্ত করিতে পারেন না। শিক্ষক যদি তাহা না পারেন—তাঁহার দুর্ভাগ্য। কেবল বক্তৃতা বিষয়কে নীরস করে। শিক্ষকের এই সমস্ত পড়ার সম্বন্ধে আমরা পরে বিস্তৃততর আলোচনায় প্রবেশ করিব।

শিক্ষার্থীদের সঙ্ঘবদ্ধ কার্য্যদ্বারাও শিক্ষাকে প্রাণবন্ত করা যায়। ছাত্রছাত্রিগণ সঙ্ঘযদ্ধভাবে হাতের কাজ, প্রাগঐতিহাসিক যুগের মানবের গুহানির্ম্মান প্রভৃতি রচনা, অভিনয় প্রভৃতি দ্বারা ইতিহাস পঠনাকে সজীব করিতে পারে। ইতিহাস শিক্ষক যদি ইতিহাস পড়াইতে গিয়া কেবল নোট

দেন বা নিজে পরিশ্রম করিয়া কেবল বক্তৃতাই দেন তবে স্বভাবতঃ ইতিহাস নীরস হইয়া পড়িবে। বিষয়টির দোষ নাই—সেক্ষেত্রে শিক্ষকেরই দোষ।

ইতিহাস শিক্ষককে অতীতের ইতিহাসকে বর্ত্তমানের ঘটনাসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে অধ্যাপনা করাইতে হইবে। শিশুরা সহজেই অতীতের সম্বন্ধে কল্পনাসৌধ নির্ম্মাণ করিতে পারে। কিন্তু আপেক্ষাকৃত বড়রা তাহা সহজে পারে না। আর ইতিহাসের সহিত কল্পনার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। অতএব অপেক্ষাকৃত বড়দের আধুনিক পরিবেশের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া শিক্ষা দিতে হইবে।

ইতিহাস শিক্ষককে খুব খুটিনাটির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া শত সাবধানে অগ্রসর হইতে হইবে। বারংবার পর্য্যালোচনা, পুনরাবৃত্তি প্রভৃতি দ্বারা বিষয়টির সম্বন্ধে শিক্ষার্থিকে সচকিত রাখা দরকার। অধীত বিষয় হইতে ক্ষুদ্র নিবন্ধও রচনা করার চেষ্টা করা যাইতে পারে।

ইতিহাস শিক্ষাপ্রদানে আর একটি প্রধান অসুবিধা—সন ও তারিখ স্মরণ রাখা। অনেক সময় অনেক শিক্ষার্থি এজন্য বহু অভিযোগও করে। এই সম্বন্ধে একদলের মত এই তারিখ বাদ দিয়া ইতিহাসের ঘটনাসমূহ পড়া হইলেই চলিতে পারে। অপর দল বলেন "ঘটনার বিবরণ পড়িবে—অথচ কোন সময় উহা ঘটিল ইহা জানিবে না—এ রকম ইতিহাস পড়ার কোন অর্থ হয় না। বাস্তব জীবনে কি আমরা কালকে অবজ্ঞা করিয়া চলিতে পারি ?"

এ সম্বন্ধে উভয় মতের সামঞ্জস্যকারিগণ বলেন, "তারিখ, সন আমাদের মনে রাখিতে হইবে বৈ কি ! কিন্তু উহা সন তারিখ হিসাবে নহে—উহা সংঘটিত ঘটনার আবর্ত্তের পরস্পরের যুগের তারতম্য স্মরণ রাখার জন্য বা বিশেষত্বসমূহ স্মরণ রাখার জন্যই পড়া প্রয়োজন। তারিখ হিসাবে নহে—ঘটনার সম্পর্ক হিসাবে যেমন যুগ হইতে যুগান্তরের তফাৎ হিসাবে ইহা পড়া দরকার। তারিখগুলি হইতেছে সেই সমস্ত সূচি যাহার উল্লেখপূর্ব্বক আমরা প্রধান প্রধান ঘটনাসমূহ অপ্রধান হইতে পৃথক করিতে পারি।

সর্ব্বোপরি কথা ইতিহাস শিক্ষককে সর্ব্বদা—তাঁহার বৈচিত্র্যময় পন্থা অনুসরণের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। ইতিহাস অধ্যাপনায় শিক্ষকের যতটা নিত্য নব পন্থার উদ্ভাবনার প্রয়োজন হয়—অন্য কোনও বিষয়ে ততটার প্রয়োজন হয় না।

শিক্ষোপকরণ সমূহ

ইতিহাস শিক্ষকের শিক্ষোপকরণ বলিতে প্রধানতঃ বুঝা যায় পাঠ্য-পুস্তক এবং তাঁহার ব্লাকবোর্ড। ফিলম্, ফিলমের অংশ বা বেতার এইগুলিও আধুনিক যুগে ইতিহাস শিক্ষাদানের অপরিহার্য্য অঙ্গ বলা যাইতে পারে।

পাঠ্য পুস্তক সম্বন্ধে আমরা পরবর্ত্তি অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা করিব।

ব্লাকবোর্ডের প্রয়োজনীয়তা খুব বেশী। শিক্ষক প্রয়োজন মত রঙ্গিণ চকখড়িও ব্যবহার করিতে পারেন। ইহাতে পাঠদান অধিকতর মনোজ্ঞ হয়। শিক্ষক সর্ব্বদাই সতর্ক থাকিবেন যেন ব্লাকবোর্ডের লেখা সুস্পষ্ট হয়, যুগরেখা প্রভৃতি সুঅঙ্কিত থাকে এবং সকলের পিছনের বেঞ্চ হইতে যেন সমস্ত সুস্পষ্টরূপে দেখা যায়।

মানচিত্র ইতিহাস শিক্ষার একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ। ছাত্রছাত্রিদের নিজস্ব মানচিত্র বই থাকিলে ভাল হয়। বিদ্যালয়ে ঐতিহাসিক মানচিত্র সমূহ রাখা প্রয়োজন। আমাদের দেশের শতকরা ৯৮টি বিদ্যালয়ে গেলে দেখা যায় ঐতিহাসিক মানচিত্র নাই। সেরূপ ক্ষেত্রে পরিষ্কার বহিঃ রেখা অঙ্কিত মানচিত্র বিদ্যালয়ে থাকিলে শিক্ষক পাঠদানে অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানচিত্রে স্থান সমূহ দেখাইতে পারেন।

শিক্ষক বা ছাত্রছাত্রিদের দ্বারা অঙ্কিত যুগ-রেখা। অনেকে বলেন শিক্ষক কর্ত্তৃক অঙ্কিত হইলে ইহার মূল্য ছাত্রের নিকট কমিয়া যায়। যুগ-রেখা ঘটনা সমূহের পরস্পরের সন্ধিসূত্র স্থাপন করে। কোনও কোনও শিক্ষকের মতে বার বৎসরের অনুর্দ্ধ শিক্ষার্থীদের পক্ষে যুগ-রেখা মূল্য বহন করে না—আবার অনেকের মতে ইহা দিয়াই শিশুদের সময়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায় সহজে।

আনুসঙ্গিক পঠনীয় বিষয় বা পুস্তক সমূহ ও ইতিহাস অধ্যাপনায় সাহায্য করে। নবীন সেনের পলাশীর যুদ্ধ, যোগীন বসুর পৃথ্বীরাজ কাব্য, অক্ষয় মৈত্রের রচিত সিরাজউদ্দৌলা, মূল্যবান সহপাঠ্য পুস্তক। শিক্ষক এই সমস্ত গ্রন্থের সাহায্যে শিক্ষার্থীর মনে কল্পনা-শক্তির উদ্রেক করেন।

চিত্র, ফটোগ্রাফ প্রভৃতির সাহায্যেও ইতিহাস শিক্ষক তাঁহার শিক্ষাকে প্রাণবন্ত করিতে পারেন।

আধুনিক যুগে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সমূহের যথাযথ প্রয়োগ করিয়াও ইতিহাস পাঠদান মনোজ্ঞ করা যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ইতিহাস উপস্থাপন

শিশুদের নিকট

ইতিহাসের বিষয় কি ভাবে বিভিন্ন বয়সের ছাত্রছাত্রীদের নিকট উপস্থাপিত করা যায়,—এই বিষয়ে অনেকে চিন্তা করিয়াছেন।

প্রাথমিক বিদ্যালয়েই ইতিহাস পড়ান আরম্ভ হয়। এই সময়ে শিশুদের মনে ইতিহাস সম্বন্ধে যে রশ্মি দান করা হয়—তাহার মূল্য অসীম। অতএব এ বয়সের শিশুদের ইতিহাসের শিক্ষাদানের গুরুত্বও কম নয়। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের সর্ব্বনিম্নস্তরে প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহে যে পন্থায় ইতিহাস পড়ান হয়—তাহাকে বরং তোতাপাখীর বুলি আদায় করা বলা যাইতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় দণ্ড হস্তে শিক্ষক একটির পর একটি করিয়া পড়া আদায় করিয়া যাইতেছেন। তাঁহার পাঠদানে কোনও রস নাই—আদায়েও তেমনি নিরাসক্ত ভাব। বিদ্যালয় পরিদর্শকগণ সকলেই এই ধরণের ইতিহাস পাঠ প্রদান দেখিয়া স্তম্ভিত হন।

ইতিহাস শিক্ষা প্রদান দেশ, কাল, পাত্র ভেদে তারতম্য হয়। কিন্তু মোটামুটি নিম্নলিখিত সাধারণ বিষয় কয়টির প্রতি লক্ষ্য রাখিলে সুফলপ্রদ হয়:—

(ক) নিম্নস্তরে শিশুদের নিকট নির্দ্দিষ্ট ঘটনা উপস্থাপিত করিতে হইবে।

(খ) অপেক্ষাকৃত উচ্চশ্রেণীতে ঘটনা সমূহের সাধারণ বিবরণ এবং ঐতিহাসিক তত্ত্ব বিস্তৃতরূপে উপস্থাপিত করিতে হইবে। এই উপস্থাপনে মূল সূত্র সমূহ স্থির রাখিতে হইবে।

(গ) ঘটনা সমূহ সর্ব্বদাই নির্দ্দিষ্ট পন্থায় আলোচনা করিতে হইবে। শিক্ষার্থীদের সম্মুখে মানচিত্র, যুগ-রেখা বা আনুসঙ্গিক সাহায্যকারি দ্রব্য সমূহ রাখিতে হইবে।

(ঘ) শিক্ষার্থীগণ যেন সর্ব্বদাই ঐতিহাসিক ক্রম বিষয়ে অবহিত থাকে। শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীদের যুগ সম্বন্ধে সচেতন রাখিতে সর্ব্বদা চেষ্টা করিবেন।

(ঙ) সর্ব্বদাই অধীত বিষয়ের পুনরাবৃত্তি করিতে হইবে এবং অধীত বিষয় সমূহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইবে।

(চ) যাহাই শিক্ষার্থীগণের নিকট উপস্থাপিত করা হউকনা বিস্তৃতভাবে করিতে হইবে।

(ছ) অবিন্যস্তভাবে বা যদৃচ্ছাক্রমে কখনও ঘটনা ছাত্রদের নিকট অর্পণ করিতে হয় না। যাহাই পরিবেশিত হউক না কেন সুবিন্যস্ত হওয়া চাই।

(জ) পাঠ্যবিষয় পূর্ব্বাহ্ণেই যথোচিত প্রস্তুত রাখা উচিত এবং ছাত্রদের নিকট যাহা উপস্থাপিত করা হইবে তাহা যেন যথা সময়ে এবং যথাযথ ভাবে করা হয়।

বিদ্যালয়ের শ্রেণী সমূহকে আমরা মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করি—নিম্ন, মধ্যম এবং উচ্চ শ্রেণী।

নিম্ন শ্রেণীতে অধ্যাপনা

শিশুরা স্বভাবতঃ গল্প শুনিতে ভালবাসে। অতএব নিম্নশ্রেণীতে ইতিহাস অধ্যাপনা করিতে গিয়া শিক্ষককে সর্ব্বদাই বর্ণনার আশ্রয় লইতে হয়। শিক্ষকের বর্ণনা ভঙ্গী মনোরম হওয়া প্রয়োজন। যে শিক্ষক তাহা পারিলেন না—তিনি কখনও নিম্নশ্রেণীতে ইতিহাস পড়াইতে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না। আমাদের দেশের বহু লুপ্ত ঐতিহাসিক

সম্পদ মা, ঠাকুরমা, ঠাকুরদাদাদের মুখে মুখে শোনা যায়। উহা যেমন চিত্তাকর্ষক, তেমনি শিক্ষাপ্রদ।

তাহাছাড়া বিশ্বামিত্র, অগস্ত্য, হরিশ্চন্দ্র, অশোক প্রভৃতির কাহিনীও মনোজ্ঞ করিয়া বর্ণনা করিতে পারিলে শিশুরা তাহা হইতে ঐতিহাসিক মনোবৃত্তি অর্জ্জন করিতে পারে। এই সমস্ত বর্ণনায় স্থান, প্রাকৃতিক দৃশ্য, ভৌগলিক অবস্থান, সামাজিক অবস্থার যথাযথ বিস্তৃত বিবরণ থাকিলে অধিকতর চিত্তাকর্ষক হয়।

গল্প বলিতে বলিতে শিক্ষককে শিশুদের হাসির সঙ্গে হাসি, তাহাদের আনন্দের সঙ্গে আনন্দ করিতে হইবে। শিশুর প্রাণ লইয়া শিশুকে গল্প বলা প্রয়োজন। এজন্যই ইতিহাস শিক্ষকের দায়িত্ব গুরু।

ইতিহাস শিক্ষককে সর্ব্বদা ইহাও লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন পাঠ সময় বা যুগের ক্রম অনুসারে ছাত্রদের নিকট উপস্থাপিত করা হয় এবং যথাসম্ভব পরপর ঘটনা সমূহের পরস্পরের অন্বয় স্থাপন করা হয়। ছাত্রদিগের দ্বারা যুগরেখা অঙ্কিত করাইয়াও সময় জ্ঞান দেওয়া যাইতে পারে। কাহারও মতে শিশুদের নিকট যুগরেখার সমস্যা না আনিলেই ভাল হয়। আমরা এতক্ষণ শিক্ষক কি করিবেন তাহাই বলিয়াছি। শিক্ষার্থীদের কি কিছুই করিবার নাই? আছে বৈকি! ছাত্রকে পাঠদান কালে সর্ব্বদা ছোট ছোট প্রশ্ন দ্বারা সচকিত রাখা একান্ত প্রয়োজন। শিশুরা পাঠ্য বিষয় সম্বন্ধে যেটুকু যাহা জানে তাহাদের বলিবার বা প্রকাশ করিবার সুযোগ দেওয়া উচিত। পড়ান শেষ হইলে শিশুদের মুখে মুখে সংক্ষিপ্তসার বলিতে বলা যাইতে পারে। শিশুরা যাহাতে সুস্পষ্টরূপে এবং নির্দ্দোষভাবে বক্তব্য প্রকাশ করিতে পারে—তাহার বিষয়েও সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

ছোট ছেলেমেয়েরা আপন মনে কত কি প্রস্তুত করিতে ভালবাসে। শিক্ষার্থীরা যদি প্রাচীন কালের গৃহ নির্ম্মাণ, আদিম যুগের যন্ত্রপাতি, তাহাদের মত পোষাক পরা পুতুল নির্ম্মাণ করিবার প্রচেষ্টা করে—তাহারও উৎসাহ দেওয়া উচিত।

এই বয়সের ছাত্রছাত্রিরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভিনয় দ্বারাও ইতিহাসের ভিত্তিকে দৃঢ় করিতে পারে।

এই স্তরে পাঠ্য পুস্তক থাকা উচিত কিনা ইহা লইয়া বহু আলোচনা হইয়াছে। বেশীর ভাগ শিক্ষকেরই মত দু একখানা পাঠ্য পুস্তক থাকা ভাল। ইহা জ্ঞান প্রসারণে এবং দৃঢ়ীকরণে সহায়ক। শ্রেনীর অধ্যাপনার পর গৃহে গিয়া উহার পুনরাবৃত্তির পক্ষে পুস্তক পাঠ একান্ত প্রয়োজন হয়। পড়ান শেষ হইলে শিক্ষক ছাত্রদের একজন একজন করিয়া পাঠ্য পুস্তকখানা পড়িতে বলিতে পারেন এবং তাঁহার নিজের জ্ঞানভাণ্ডারও ইহাদের নিকট উন্মুক্ত করিতে পারেন।

শিক্ষক সহ-পাঠ্য পুস্তকও ছাত্রছাত্রিদের নিকট দিতে পারেন। এই সমস্ত পুস্তকের মধ্যে জীবনী, ছোটখাট গল্প, কবিতা, প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত। চিন্তাশীল লেখকগণ শিশুদের নিকট পাঠ্য বিষয় সমূহ কি ভাবে চিত্তাকর্ষক করা যায়—তাহার দৃষ্টান্ত দিয়াছেন।

তাঁহারা বলেন শিশুদের পিতামহ, বৃদ্ধ পিতামহ, প্রবৃদ্ধ পিতামহের ফটো থাকিলে তাহা দেখাইয়া তদানীন্তন যুগের পোষাক, বস্ত্র, দাড়ি গোফ, চালচলন প্রভৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জ্জনে সহায়তা করিতে পারা যায়। কলিকাতার রাস্তা বহু ইতিহাস জড়িত—শিশুকে বিদ্যাসাগর স্ট্রিট, বেথুন রো, ডাফ স্ট্রিট, নফর কুণ্ডু রোড, মনোহর পুকুর রোড প্রভৃতি দেখাইয়া—বহু বিষয়ে ঐতিহাসিক কৌতুহল জাগ্রত করা যায়। পল্লী-গ্রামেও প্রাচীন দেউল, পুকুর, পথ ঘাট প্রভৃতির সহিত বহু ঐতিহাসিক তথ্য জড়িত থাকে। প্রাচীন সৌধ, কবরখানা, স্মৃতিস্তম্ভ প্রভৃতিত শিশুকে ঘুরাইয়া দেখাইলে ঐতিহাসিক কৌতূহল উদ্দীপিত করা যায়। শিশুরা এই সমস্ত বিষয়ে দৈনিক লিপি লিখিয়া রাখিতে পারে।

শিশুরা অতীতের যুগে চলিয়া যাইতে ভালবাসে। ইতিহাসের কাহিনী পড়িয়া অনেক শিশু মানবের আদিম অবস্থা অনুকরণ করিতে ভালবাসে। তাহারা আদিম মানবের অনুকরণে সংগ্রাম করিতেও ভালবাসে। এই সমস্ত কার্য্যের ভিতর দিয়া প্রকৃত আদিম ইতিহাসের রস

আস্বাদন করিতে শিশুরা আগ্রহশীল হয়। অপেক্ষাকৃত বড় শিশুরা অতীতের সহিত ক্রমোন্নতির স্তরকে তুলনা মূলক ভাবে দেখিতে ভালবাসে।

ইতিহাসের মাধ্যমে শিশু মহৎ চরিত্রের সহিত পরিচিত হয় অতএব ঐতিহাসিক জীবন-বৃত্তান্ত পর্য্যালেচনা এই বিষয়ে সুযোগ সৃষ্টি করে। প্রথম প্রথম খুব সহজ সরল ভাষায় আরম্ভ করিয়া কাল ক্রমে ইহার বিস্তার করিতে হয়।

প্রাচীন যুগের সামাজিক জীবন যাত্রা সম্বন্ধেও শিশুদের শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। অতীতের ইতিহাস পড়িলে জানা যায় কিরূপে সমবেত জীবন যাত্রাই প্রধান লক্ষ্য ছিল। আদিমানব তো একত্র হইয়া থাকা ছাড়া পশুদের সহিত বন্য জন্তর সহিত সংগ্রাম করিতে পারিতনা। তারপর যুগে যুগে খাদ্য শস্য উৎপাদন, বিভিন্ন স্থানের সহিত বানিজ্যের আদান প্রদান এ সমস্ত কথাও গল্পের মাধ্যমে শিশুদের সম্মুখে আনা যায়। কিন্তু এই সমস্ত বিবরণ প্রদান করিবার পূর্ব্বে শিক্ষককে সর্ব্বদাই অবহিত থাকিতে হইবে যে তিনি যেন কোনও বিষয় জটিল রূপে উপস্থাপিত না করেন। তিনি শিশুদের চির পরিচিত খাদ্য সম্ভার দিয়াই বিষয়ের অবতারণা করিবেন যেমন চাউল কি প্রকারে আসিল। গমের রুটি মহেঞ্জোদারোর গম এই প্রকার পরিচিতি হইতে ক্রমশঃ অপরিচিতির মধ্যে আসিতে পারেন। এই প্রকারে যন্ত্র পাতির উৎপত্তি' চাষের প্রয়োজনে লাঙ্গল হইতে বর্ত্তমান ট্রাকটারের বিবরণ, গৃহ নির্ম্মানের বিবর্ত্তন বাদ, আসবাব পত্রাদি, যাতায়াতের পথ সৃষ্টি, অগ্নি, আলো বায়ু প্রভৃতির উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ শিক্ষার্থীদের নিকটই চিত্তাকর্ষক করিয়া উপস্থিত করা যায়।

মধ্যস্তর

আমরা এই স্তরে প্রথমিক বিদ্যালয় হইতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের বিষয় আলোচনা করিব।

এই সময় শিশু কৈশোরের মধুর স্বপ্নময় দরজায় উপনীত হয়।

(ক) তাহার বাস্তব বোধ জন্মিতে দেখা যায়। এখন আর উপকথার গল্প তেমন ভাল লাগে না।

(খ) তাহার স্মৃতি ও কল্পনা সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ স্তরে থাকে।

(গ) গণিতিক জ্ঞানের সাহায্যে তাহার সময় জ্ঞান তথা যুগ সম্বন্ধেও জ্ঞান সুষ্ঠুতর হইয়াছে।

(ঘ) সে এখন মূলসূত্র সমূহ এবং চিন্তাধারার সম্মুখিন হইতে পারে।

(ঙ) তাহার এখন সৃজনী শক্তি ও বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ভাষার উপর অধিকার জন্মিয়াছে।

(চ) দুঃসাহসিক অভিযান এবং উত্তেজনাময় কার্য্য তাহার ভাল লাগে। বহিঃভ্রমণ মনোমুগ্ধকর প্রতীয়মান হয়।

(ছ) এই বয়সের পাঠ্য বিষয় দৈনন্দিন জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া পড়াইলে ভাল হয়।

(জ) স্থানীয় ইতিহাস এই সময়কার উপযুক্ত পাঠ্য।

এই সন্ধিক্ষণে আমরা কি প্রকারে ছাত্র ছাত্রীদের পাঠ্য বিষয় রচনা করিব? আমাদের লক্ষ্য হইবে—

(ক) ইতিহাসের প্রধান প্রধান ব্যক্তি এবং ঘটনাদি শিক্ষার্থীদের নিকট উপস্থাপিত করা।

(খ) শিক্ষার্থীদের সাহায্যে যুগরেখা সঙ্কলন করা।

(গ) ইতিহাসের ঘটনা সমূহের ব্যাখ্যা করা এবং বর্ত্তমানের সহিত তাহাদের অণ্বয় স্থাপন করা।

(ঘ) এই সময়কার বর্ণণা গল্পমূলক জীবন কাহিনীমূলক হবে না। শিক্ষক মহাশয় সুস্পষ্ট ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির দিকে শিক্ষার্থীগণের মন আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা করিবেন।

(ঙ) পাঠ্যপুস্তক ও তাহার যথাযথ অনুসরণের প্রতিও এই সময় লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। পাঠের প্রারম্ভে এবং পরে উভয় সময়ই পুস্তক পাঠ করা প্রয়োজন। কেহ কেহ বলেন যে

শিক্ষক পাঠদানের পূর্ব্বেই শিক্ষার্থীগণ পাঠ্য বিষয় পড়িলে বিষয়ের সরসত্ব নষ্ট হয়। কিন্তু এই যুক্তি গ্রহণযোগ্য নহে। কেন না শিক্ষকরূপে অনেকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে যে পূর্ব্বে অধীতব্য বিষয় একবার অধ্যয়ন করা থাকিলে পাঠ গ্রহণ অধিকতর মনোজ্ঞ প্রতীয়মান হয়। সর্ব্বশেষে আর একবার অধ্যয়ন করিলে পাঠ্য বিষয়ে জ্ঞানের দৃঢ়তা স্থাপন করা হয়।

(চ) প্রয়োজনবোধে বিভিন্ন গ্রন্থকারের পাঠ্যপুস্তক ও পড়িবার সুযোগ প্রদান করা যাইতে পারে।

(ছ) অধ্যাপনার বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন শিক্ষার্থীগণ রাজনৈতিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক বা অর্থনৈতিক ইতিহাসও বিচার করিবার সুযোগ পায়। অনেক সময় আমাদের ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তকে বা অধ্যাপনার মধ্যে এ সংযোগ থাকে না। ইহা পরীক্ষার্থীদের পক্ষে ক্ষতিকর হয়।

(জ) স্বদেশের ইতিহাস পড়িবার সঙ্গে সমসাময়িক অন্যান্য দেশের ইতিহাসের সহিতও যথাসম্ভব সংযোগ স্থাপন করা প্রয়োজন। অনেকে মনে করেন—কেবলমাত্র দেশের ইতিহাস অধ্যয়ন করিলেই যথেষ্ট। আমাদের এজন্যই সমগ্র বিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতে পাঠ্যসূচি নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে।

(ঝ) ইতিহাসের এক বিরাট অংশ জুড়িয়া থাকে যুদ্ধবিগ্রহের কাহিনী। অনেক শিক্ষক ইহার খুঁটিনাটি লইয়া সময় কাটান। শিক্ষকের লক্ষ্য থাকা উচিত বিশ্বের পরিস্থিতিতে এই যুদ্ধের ফলাফল কতখানি স্থান অধিকার করে।

(ঞ) এই স্তরেও শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দ্বারা ঐতিহাসিক নাটক অভিনয় করাইলে সুফলপ্রদ হয়।

(ট) এই স্তরে ছাত্রদের নিকট হইতে কিছু কিছু লিখিত বিবরণ বা ঐতিহাসিক প্রশ্নের উত্তর আদায় করা প্রয়োজন। খুব বেশী লেখা কাজ আদায় করিলে শিক্ষার্থীগণের পক্ষে তাহা বিরক্তিকর হয়। লিখিবার বিষয়সমূহও সুনির্ব্বাচিত হওয়া প্রয়োজন। শিক্ষক এই বয়সের ছাত্রদের কি কি কাজ করাইতে পারেন, তাহারও নির্দ্দেশ কেহ কেহ দিয়াছেন। একজন ছাত্রকে বলা যাইতে পারে যে 'তুমি সিপাহী বিদ্রোহের সময় ব্যারাকপুরের কল্পনা করিয়া একখানা চিঠি লিখিতে পার' অথবা 'সম্রাট হর্ষবর্দ্ধনের যুগের একজন লোক নিজেকে কল্পনা করিয়া লইয়া তাঁহার সন্তোষক্ষেত্রের দান সম্বন্ধে একটি বর্ণনামূলক চিঠি লিখিতে পার।' ইতিহাসের শিক্ষক নিজেই পন্থা খুঁজিয়া বাহির করিবেন।

(ঠ) রণক্ষেত্রের চিত্র বা সৈন্যগণের গতি বা বিভিন্ন দেশের বৈদেশীকদের আগমন প্রভৃতি ব্ল্যাকবোর্ডে দেখান যাইতে পারে। পড়ান শেষ হইলে বোর্ড হইতে সংক্ষিপ্তভাবে ছাত্রগণ গ্রহণ করিতে পারে।

উচ্চস্তরে ইতিহাস শিক্ষাপ্রদান

দেশ এবং জাতি বর্ণ নির্ব্বিশেষে দেখা যায় যে ১২ হইতে ১৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তরুণ কিশোর কিশোরীদের অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন হইতে আরম্ভ করে। এই সময় তাহাদের শরীরে যেমন পরিবর্ত্তন হইতে থাকে মনেও তেমনি দেখা দিতে সুরু করে পরিবর্ত্তন। শিক্ষক মাত্রই জানেন এই সন্ধিক্ষণ তাহার পক্ষে সমস্যামূলক—কোন শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে ইহা মহেন্দ্রক্ষণ হইয়া দাঁড়ায়, কাহারও ক্ষেত্রে উহা বারবেলার যাত্রার মত মনে হয়। ইতিহাস শিক্ষকের নিকট ইহা অধিকতর সমস্যামূলক—তিনি জানেন হয় শিক্ষার্থীর হৃদয়ে এই সময়ে ইতিহাসের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও

প্রীতি আকর্ষণ করিতে পারিবেন নয়তো চিরদিনের জন্য ছাত্রের নিকট উহা বিস্বাদরূপে পরিগণিত হইয়া থাকিবে; যেমন পড়িবে তেমন ভুলিয়া যাইবে। শৈশবে ইতিহাসের যে সমস্ত কাহিনী লইয়া শিশু রঙীন স্বপ্ন দেখিয়াছিল, এখন সে উহার গূঢ় অর্থ, তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিবার চেষ্টা করিবে। এই সময় ইতিহাস পাঠ তাহাকে নাগরিক কর্ত্তব্য সম্বন্ধে অবহিত করিতে চেষ্টা করিবে।

আমাদের দেশে প্রচলিত স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় ছাত্রছাত্রীদের গড় বয়স ১৫।১৬ বলা যাইতে পারে। এই শেষকয়বৎসরের ইতিহাস শিক্ষার্থীকে অতীতের পরিপ্রেক্ষিতে আধুনিক ঘটনার সমালোচনামূলক জ্ঞান জন্মায়। শিক্ষকের হাতে সময় সংক্ষিপ্ত। তিনি প্রধানতঃ চেষ্টা করেন ছাত্রকে তাহার জাতীয় ইতিহাস শিক্ষাদান করিতে। ছাত্রগণ যখন মানব জাতির সভ্যতার ক্রমবিকাশের ইতিহাস পড়িবে, যখন তাহারা দেখিবে জগৎ কি ভাবে যুগে যুগে মনীষিগণের নিকট ঋণী—তখন তাহারা আপনা হইতেই বিশ্বের কল্যাণকামীদের বিষয়ে তথা জগতের সভ্যতার বিকাশ সম্বন্ধে কৌতুহলাক্রান্ত হইবে।

এখন প্রশ্ন দাঁড়ায় শিক্ষক কি ভাবে অন্যান্য জাতির তুলনামূলক পর্য্যায়ে জাতীয় ইতিহাস পড়াইবেন। শিক্ষকের প্রধান এবং মুখ্য লক্ষ্য থাকে তাঁহার ছাত্রগণ যেন আন্তর্জ্জাতিক সখ্য ইতিহাস পাঠে অর্জ্জন করিতে পারে এবং তাহার মনে যেন কৌতূহল জাগে যাহাতে সে গবেষণামুখী হয় এবং ঐতিহাসিক তথ্যগুলি সম্বন্ধে চিন্তাশীল হয়।

জাতীয় ইতিহাস সব সময়ই আন্তর্জ্জাতিক ভিত্তির উপর দাঁড় করান উচিত। আন্তর্জ্জাতিক কৃষ্টির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অধীতব্য বিষয়সমূহ ছাত্রদের নিকট উপস্থিত করা যাইতে পারে। ভারতের ইতিহাসে আর্য্যদের আগমনের সহিত পৃথিবীর ইতিহাস জড়িত। মুসলমানদের আক্রমণ ইসলাম ধর্ম্মের আন্তর্জ্জাতিক প্রচার, ইউরোপিয়ানদের আগমন সমগ্র জগতের বাণিজ্যিক সাড়া—এগুলি লক্ষ্য রাখিয়া শিক্ষক পাঠ্য বিষয় উপস্থিত করিবেন। এই প্রকার আন্তর্জ্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ইতিহাস

অধ্যয়নকালে ছাত্র বুঝিতে পারে যে প্রত্যেক জাতির মধ্যেই ভাল এবং মন্দ উভয়ই আছে। যাহার যেটুকু ভাল সেটুকুই আদর্শ।

শিক্ষক অধ্যাপনা কালে ছাত্রদের পাঠ্য বিষয়ের এমন অতিরিক্ত জ্ঞান জন্মাইবারও চেষ্টা করিবেন যাহাতে ছাত্র জগৎ সমাজের বিষয়ে চিন্তাশীল হয়। আধুনিক জগৎ আন্তর্জ্জাতিক ভিত্তির উপর গঠিত। অনেক সময় দেখা যায় শিক্ষক যুদ্ধের বিবরণ অধ্যাপনা প্রসঙ্গে স্ব দেশের ত্রুটি সমূহ গোপন রাখিয়া অন্য দেশের ত্রুটিটাই বড় করিয়া প্রদর্শন করেন। এই সব ক্ষেত্রে শিক্ষকের উচিত কেবলমাত্র ঘটনা সমূহের বিবরণ উপস্থাপিত করা। ছাত্রগণের কার্য্য হইতেছে কেন এই সমস্ত যুদ্ধ ঘটিল—তাহার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করা। যদি ইহাতে অধ্যয়নার্থীগণ দেখিতে পান যে তাহারা প্রকৃত কারণের সন্ধান করিয়াও কোনও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিলেন না—তাহাতেও দুঃখের কোনও কারণ থাকিবে না। শিক্ষকের কাজ এইখানেই যে আন্তর্জ্জাতিক জ্ঞান-বিদ্যাবুদ্ধির দ্বার ছাত্রদের নিকট উন্মুক্ত করা।

কোনও কোনও দেশ কেবলমাত্র স্বজাতির ইতিহাস পড়াইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে চাহে না। তাহারা ইচ্ছা করে সমগ্র মানব জাতির ক্রম বিকাশের ইতিহাসই ছাত্রগণ অধ্যয়ন করুক। ইহা শুভলক্ষণ সন্দেহ নাই। ইহাতে বিশ্বমানবের ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধে—আন্তর্জ্জাতিক উদারতার প্রসার হয়।

কোনও কোনও ক্ষেত্রে বিশ্বের ইতিহাস পড়াইবারও প্রস্তাব করা হয়। অনেক সময় শিক্ষকগণের ভূয়সী জ্ঞানের অভাব ইহার অন্তরায় হয়।

নির্দ্দিষ্ট বিষয় সমস্যাকে কেন্দ্র করিয়া কেহ কেহ এই স্তরের ইতিহাস অধ্যয়নের পক্ষপাতি। ইহার সুবিধা এবং অসুবিধাও আছে। প্রধান অসুবিধা এই বিষয় কেন্দ্র করিয়া (Topical bais) ইতিহাস সাধারণতঃ লিখিত হয় না। অতএব অধ্যাপনার পক্ষে এই পন্থায় অগ্রসর হওয়া কষ্টকর। অপর দিকে সুবিধা এই যৌথ অধ্যয়ন-প্রথায় অগ্রসর হইলে

শিক্ষার্থীগণ অধিকতর আনন্দ পায় এবং স্ব স্ব চিন্তাধারায় প্রসারতা আনিতে পারে।

কেহ কেহ সম্পূর্ণ বিভিন্ন দেশের ইতিহাস পড়াইবারও পক্ষপাতি। এতক্ষণে বিষয় নির্দ্দিষ্ট হইল।

শিক্ষকের আচরণ বিষয়ে আলোচনা করা হইতেছে। শিক্ষককে সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে এর পর তাঁহার অধিকাংশ ছাত্রের আর ইতিহাসের সহিত সংযোগ থাকিবেনা। অতএব এইসময় তাঁহার ছাত্রকে জীবন সংগ্রামে লিপ্ত হইবার পূর্ব্বে ইতিহাসের সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ধারণা জন্মাইয়া দিতে হইবে। শিক্ষককে হইতে হইবে উদার, বৈচিত্র্যময়, পরমতসহিষ্ণু, দূরদৃষ্টি সম্পন্ন। তিনি এই সময় ছাত্রকে দিবেন নূতন ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধান, নূতন পথের ইঙ্গিত। তিনি শিষ্যদের বুঝাইবেন ইতিহাসের ঘটনাবলীর আবর্ত্তন, রাজা এবং রাজনৈতিকদের উত্থান পতনের কাহিনী, পুঁজিবাদী এবং বিদ্রোহীদের সংগ্রাম, এবং তাহাদের নিত্য নূতন তত্ত্ব অনুসন্ধানে প্রোৎসাহিত করিবেন।

শিক্ষক ছাত্রকে এই সময় অর্থনৈতিক ইতিহাসের ধারা অনুসরণ করিতে শিক্ষা দিবেন। যুদ্ধ বিগ্রহ, রাজনীতি ইহাই যেন ছাত্রের শিক্ষাকেন্দ্র হইয়া না দাঁড়ায়।

শিক্ষক এই সময় জ্ঞান ও বুদ্ধির ভাবধারা এবং নৈতিক বলের ইতিহাস ক্ষেত্রে প্রাধান্য বিষয়ে ছাত্রগণকে অবহিত করিতে চেষ্টা করিবেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ধর্ম্ম ও নীতি বাদের প্রচারকগণের ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে ছাত্রদের নিকট তৎকালীন এবং বর্ত্তমানের পরিস্থিতিতে তাহাদের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিবেন। সমগ্র জগতের পরমবান্ধব মানবকূলের হিতৈষীরূপে বৈজ্ঞানিকগণের যুগে যুগে দান, দাসপ্রথা নিরোধকল্পে সমাজ কল্যাণ কর্ম্মীদের প্রচেষ্টা, রেডক্রশ আন্দোলন, লুইপাস্তর, জেনেট প্রভৃতির বিবরণ—এই সময় ছাত্রছাত্রীদের নিকট উপস্থাপিত করা প্রয়োজন। আধুনিক যুগ বিজ্ঞানের যুগ। চিকিৎসা বিদ্যার ইতিবৃত্ত, শিল্প প্রসারের ইতিহাস প্রভৃতিও এই

সময় বিশদরূপে পর্য্যালোচনা করা যায়। এই সমস্ত ইতিহাসতো সমগ্র জগতের ইতিহাসের সহিত বিজড়িত।

এই সময় শিক্ষক শিক্ষার্থীগণকে শান্তি এবং সহিষ্ণুতার প্রতীক মহাপুরুষদের বিষয়ও আলোচনা করিয়া শিক্ষা দিতে পারেন। তিনি ছাত্রদের নিকট পর্য্যালোচনা করিয়া দেখাইতে পারেন যে সত্যের পথ কত সরল এবং যুগযুগান্তরের তমিস্রা ভেদ করিয়াও সত্যব্রতীদের চরিত্র উজ্জলরূপে প্রতিভাত হয়। অতীতের অত্যাচার, নির্ম্মমতা, নিষ্ঠুরতার চেয়েও সত্যকে উজ্জলতররূপে যেন প্রতিফলিত করাই শিক্ষকেব লক্ষ্য হয়। শিক্ষক ইহাও ছাত্রদের সম্মুখে উপস্থিত করিতে পারেন যে দেশে যেখানে এক সময়ে দেখা গিয়াছিল যে মতবাদ গরল সৃষ্টি করিয়াছিল তাহাদ্বারাই এ স্থানে এখন সৃষ্টি হইয়াছে অমৃতের।

সমগ্র জগত আজকাল আন্তর্জ্জাতিক বন্ধনে আবদ্ধ। এই স্তরের শিক্ষার্থীদের নিকট রেডক্রশ, বয়স্কাউট, ইউ. এন. ও, বিশ্বব্যাঙ্ক প্রভৃতির বিষয়ে জ্ঞান ভাণ্ডারের দরজা উন্মুক্ত করাও প্রয়োজন।

এই স্তরের অধ্যাপনার লক্ষ্য থাকিবে প্রধাণতঃ আলোচনা। শিক্ষক পাঠের প্রারম্ভে সামান্য একটু মুখবন্ধ দ্বারা বিষয়টি উপস্থাপিত করিবেন এবং ধীরে ধীরে ছাত্রদের নিকট হইতে প্রশ্নদ্বারা, তাহাদের পরস্পরের পর্য্যালোচনা দ্বারা বিষয়টি সুস্পষ্টরূপে সকলের সম্মুখে দাঁড় করাইবেন। মাঝে মাঝে ব্ল্যাকবোর্ডের আশ্রয় লইয়া বিষয় সমূহ স্পষ্টতর করিতে পারা যায়। সর্ব্বশেষ একটি নোট প্রদান দ্বারা বিষয়টির উপর সমাপ্তিরেখা টানা যায়।

ইতিহাসের উৎস সমূহ বা মূল তথ্য বিষয়ক ইতিহাসের উপকরণ সমূহও এই স্তরের উচ্চদিকে কিছু কিছু পড়ান যায়। কোনও কোনও শিক্ষক বলেন—সময় কম, শিক্ষার্থীরাও হয় তো তেমন পরিশ্রম করিতে ইচ্ছুক নয়। তদুপরি উৎসের অনুসন্ধানে প্রয়োজন গভীর এবং অক্লান্ত পরিশ্রম। অতএব এই সময় মূল বিবরণীতে না যাওয়াই ভাল। সর্ব্বাপেক্ষা বড় কথা এই—এ শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রয়োজন এমন একদল

শিক্ষকের যাহারা নিজেরাও মূল দলিল তথ্য ইত্যাদি অনুসন্ধানে দক্ষ। হয়তো এই কথা সত্যই। কিন্তু এই প্রচেষ্টার গৌরব তো তাহাতে কমেনা। যদি একটি শিক্ষার্থীর মনেও এ প্রচেষ্টার বীজ নিহিত করা যায় তাহাইতো লাভ। আমাদের স্কুল ম্যাগাজিন প্রভৃতিতে বা বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা কালে মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসির রায়, জাহানারার আত্মকাহিনীর বিবরণ বা সম্রাট অশোকের অনুশাসনের দুই একটির মূল বাহির করিলে ইতিহাসের মৌলিক দিকটির প্রতি শিক্ষার্থীর মন উন্মুখ করা যায়।

সর্ব্বোপরি কথা এই—এই স্তরে শিক্ষার্থীদের লেখার, সংক্ষিপ্তসার গ্রহণ করিবার, মূল তথ্য হইতে বিবরণ সমূহ বাছাই করিয়া তাহার চুম্বক লিখিবার অভ্যাস করান একান্ত প্রয়োজন। শিক্ষার্থীগণ কথোপকথন, চিঠিপত্র, কবিতার ছন্দ প্রভৃতি রচনা দ্বারাও ইতিহাসের সজীবতা রক্ষা করিতে পারে।

ব্যক্তিগত কার্য্য ছাড়াও সমবায়মূলক কার্য্যদ্বারাও ইতিহাসে অনুরাগ জন্মে। অভিনয় নিম্নস্তরে ও শিক্ষার্থীরা করে। তদুপরি ঐতিহাসিক বিষয়ে বিতর্ক সভায় এই স্তরে ঔৎসুক্য সৃষ্টি করে। গত ডিসেম্বরমাসে কলিকাতার ঐতিহাসিক সম্মিলনীর সময়ে সমগ্রভারতের ঐতিহাসিকগণের মধ্যে—ডাঃ রমেশ মজুমদার এবং ডাঃ বসাক এর মধ্যে—শশাঙ্ক বাঙ্গালী ছিলেন কিনা ইহা লইয়া যে বিতর্কসভা হয়—তাহা দর্শক মাত্রই উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

একত্র বিন্যাসমূলক কার্য্যের আর একটির উল্লেখ করা যাইতেছে। শিক্ষার্থীগণ বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায় সম্বন্ধে ক্ষুদ্র সংবাদপত্র রচনা, নিজস্ব রচনা বা বুলেটিন বাহির করিতে পারে। এই প্রকার এক একটি দলে একজন সভাপতি, একজন প্রচারক, একজন চিত্রকর, একজন লেখক থাকিবে এবং প্রত্যেক গ্রূপ কার্যান্তে তাহাদের কার্য্য বিবরণী শ্রেণীর সম্মুখে উপস্থাপিত করিতে

পারিবে। ঐতিহাসিক প্রদর্শনী, মানচিত্র অঙ্কন প্রভৃতি কার্য্যও গ্রুপ বিভক্ত হইয়া করিতে পারে।

বিদ্যালয়ের এই সমস্ত শ্রেণীতে ছাত্রদের সংঘবদ্ধ ভাবে ঐতিহাসিক স্মৃতি বিজড়িত স্থানসমূহ পরিদর্শনে লইয়া যাওয়া যায়। ছোট ছোট গ্রুপ হইলেই ভাল হয় কেননা তাহা হইলে দর্শনীয়—দ্রব্যসমূহ হইতে শিক্ষালাভ করতে প্রকৃত সুযোগ পাওয়া যায়। যাইবার পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য বিষয় সমূহ সম্বন্ধে পূর্ব্বে আলোচনা হইলে ভাল হয়। ইহার লাভ এই শিক্ষার্থীর মনের সম্মুখে কল্পনার দ্বার উদঘাটিত হয়—এবং সে প্রচণ্ড সম্ভাবনাময় প্রকৃত ইতিহাসের রূপ দেখিতে পায়।

অনেকে উচ্চশ্রেণীতে অধ্যাপনার সুবিধার জন্য কোনও পাঠ—এক সপ্তাহ বা এক পক্ষের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া থাকেন। সঙ্গে সঙ্গে নির্দ্দেশ এবং প্রশ্নপত্র থাকে। ইহার বিস্তৃত বিবরণ ও নমুনা পরিশিষ্টে দেওয়া হইবে। ইহার সুবিধা এই পাঠবিষয়ে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হওয়া যায়। উচ্চশ্রেণীতে এই পন্থায় অগ্রসর হইলে—ছাত্রদের স্বকীয় বুদ্ধি বিকাশেরও যেমন সুবিধা হয়—তেমনি পঠনের গতি ও দ্রুত সম্পন্ন হয়।

সপ্তম অধ্যায়

ইতিহাস প্রকোষ্ঠ

"ইতিহাস আবার একটা বিষয়—তাহার আবার একটা পৃথক ঘর। কেবল মুখস্থ আর ঝাড়া মুখস্থ এইতো কাজ" এই হইতেছে ইতিহাসের প্রতি সাধারণের দৃষ্টিভঙ্গি। কথাটা ঠিক কি? আমাদের বাংলাদেশে সম্প্রতি—ভূগোল এবং বিজ্ঞানের জন্য সংরক্ষিত প্রকোষ্ঠ রাখার জন্য পীড়াপীড়ি চলিতেছে। এখনও আমাদের অনেক বিদ্যালয়ে এই প্রকার ভিন্নপ্রকোষ্ঠ নাই। তবে ইহার প্রয়োজনীয়তা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে। এইস্থলে আবার ভিন্নমতবাদীরা বলিবেন, "বিজ্ঞানের ভিন্ন ঘরের যন্ত্রপাতির জন্য প্রয়োজন থাকিতে পারে, ভূগোলের ভিন্ন ঘরের মানচিত্রের জন্য প্রয়োজন হইতে পারে।
ইতিহাসের ঘরে আবার কি রাখা হইবে?"

ইতিহাসের প্রতি শিক্ষার্থীদের যদি সত্যিকার অনুরাগ জন্মাইতে হয়, যদি তাহাদের প্রকৃত ইতিহাসের ধারায় অধ্যাপনা করিতে হয়, তবে তাহাদের ইতিহাসকক্ষে বসিয়া পাঠদানই শ্রেষ্ঠ। সুসজ্জিত একটি ইতিহাস প্রকোষ্ঠ—শিক্ষার্থীর মন পঠিত বিষয়ে আকৃষ্ট না করিয়া পারে না। দেবতার মন্দিরের যেমন নিজস্ব একটা বিশেষত্ব থাকে—বিষয় প্রকোষ্ঠেও তেমনি একটি পৃথক সত্ত্বাময় আবহাওয়া বিদ্যমান থাকে।

ইতিহাসের ছাত্রকে সর্ব্বদাই মানচিত্র দেখিতে হয়, তাহাকে বই পড়িতে হয়, তাহার প্রয়োজন হয় আনুসঙ্গিক পুস্তকের পাঠগ্রহণের। এমন অনেক সময় হয় যে ছাত্র হয়তো তাহার প্রয়োজনীয় পুস্তকের জন্য সমস্তদিন খুঁজিয়া বেড়াইল, তাহার কাজ হইল না। ইতিহাস পড়িতে পড়িতে শিবাজীর অশ্বারূঢ় দৃপ্তভঙ্গী, সম্রাট অশোকের রাজকীয় পোষাকের পাশাপাশি তাঁহার বৌদ্ধভিক্ষুর বেশ, সিরাজ-উদ্দৌল্লার ছবি কি তাহাকে ইতিহাস পাঠে প্রেরণা যোগাইবে না। এবং এই সকলের জন্যই প্রয়োজন ইতিহাসের ভিন্ন প্রকোষ্ঠ। একটি পরিবেশ যাহার চারদিকে

ঐতিহাসিক চিত্র, ঐতিহাসিক মুদ্রা, ঐতিহাসিক গ্রন্থ—কি অধ্যয়নশীল মনকে শুচিস্নাত করিয়া—অধ্যয়নের প্রগাঢ়তার দিকে আকৃষ্ট করেনা ?

ইতিহাসের শিক্ষক মাত্রই জানেন ইতিহাস পড়াইতে গিয়া কিপ্রকারে তাঁহাকে বারংবার—প্রয়োজনীয় উপকরণের জন্য—এদিক ওদিক খুঁজিয়া বেড়াইতে হয়। মানচিত্র, পুস্তক, যুগরেখা, আনুসঙ্গিত পাঠে, হয়তো-বা তাম্রমুদ্রা—এই সকলের জন্য কোথায় তিনি ছুটাছুটী করিবেন ?

ইতিহাসের জন্য স্বকীয় একটি প্রকোষ্ঠের প্রয়োজনীয়তার দিক রাখিয়া আমরা এইবার দেখিব আমাদের একটি ইতিহাস প্রকোষ্ঠে কি কি জিনিষ থাকা প্রয়োজন।

ইতিহাস প্রকোষ্ঠে যে সমস্ত চেয়ার বা টেবিল অথবা বসিবার বেঞ্চ থাকিবে সেগুলো হালকা হওয়া প্রয়োজন। ইতিহাস প্রকোষ্ঠ সময় সময় অভিনয়, তর্ক বিতর্ক, আলোচনা প্রভৃতির জন্য প্রয়োজন হয়।

ব্লাকবোর্ডটি লম্বা এবং প্রকোষ্ঠটির—একপ্রান্ত সম্পূর্ণ হওয়া দরকার। এই দীর্ঘ অংশে বিভিন্ন অংশের ইতিহাসকে যুগ অনুসারে শিক্ষা প্রদান করা যাইতে পারে—অথবা বিবরণ লিখিত থাকিতে পারে।

ছোট ছোট বইএর সেলফ—যুগ অথবা শ্রেণী অনুসারে অথবা দেশ অনুসারে বই ভাগ করা থাকিবে।

ড্রয়ার সংযুক্ত টেবিল, বৈদ্যুতিক পয়েন্ট, এপিডায়স্কোপ, ছবি দেখানোর ম্যাজিক লণ্ঠন প্রভৃতি। প্রথম দ্রষ্টব্য বিষয় হইবে—ইতিহাস প্রকোষ্ঠে শিক্ষক এবং ছাত্র উভয়ের জন্য বিভিন্ন প্রকারের গ্রন্থ। ছাত্রদের জন্য যে পাঠ্যপুস্তক নির্দ্দিষ্ট থাকিবে তাহার অতিরিক্ত অন্যান্য গ্রন্থকারেরও পুস্তক থাকিতে পারে। অনেকের মতে এই গ্রন্থাগার বৃহৎ হইলেই ভাল হয়। কেহ কেহ বলেন—বৃহৎ গ্রন্থাগার কেবল শোভা বর্দ্ধনের জন্য মাত্র হইয়া দাঁড়ায়। পুষ্টিকর অল্প খাদ্য খাইলেই যেমন উপকার হয় তেমনি বাছাই করা পুস্তক অধ্যয়নেও শ্রেষ্ঠ জ্ঞান অর্জ্জন করা যায়।

ইতিহাস প্রকোষ্ঠে চিত্র—প্রকোষ্ঠটিকে মনোরম করে এবং পরিবেশ

সৃষ্টির সহায়ক হয়। বিভিন্ন ঐতিহাসিক বীরদের ছবি, রাজা বা দলপতিদের ছবি, বিভিন্ন যুগের মানবের ছবি, যুদ্ধের ছবি, রণক্ষেত্রের মানচিত্র, যুগে যুগে পরিচ্ছদের পরিবর্ত্তন—সবই ইতিহাস প্রকোষ্ঠটিকে অধিকতর চিত্তাকর্ষক করে। বিভিন্ন ইউরোপীয় প্রতিষ্ঠান ঐতিহাসিক ছবিসমূহ—প্রায় ন্যায্য মুল্যে বিক্রয় করে। এইগুলি সংগ্রহ করিয়া বিদ্যালয়কে সুসজ্জিত করা যায়। অনেক সময় বিভিন্ন পত্রিকায় ঐতিহাসিক ছবি বাহির হয়। সেগুলিও সংগ্রহ করিয়া ইতিহাস প্রকোষ্ঠে সাজাইয়া রাখা যায়। ছাত্র ছাত্রীদের অঙ্কিত চিত্রও থাকিতে পারে।

বিভিন্ন যুগের ছবি, যুগ অনুসারে সজ্জিত থাকিলেই ভাল। আমাদের বিদ্যালয়সমূহে আমরা ভারতের বিভিন্ন মন্দিরের চিত্র অঙ্কন করিয়া বিভিন্ন যুগের স্থাপত্য শিল্পের বিকাশ দেখাইতে পারি। এই প্রকারে সামাজিক চিত্র অঙ্কণ করিয়া ভারতের বিভিন্ন যুগের সামাজিক উৎসব প্রভৃতি সমন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা জন্মাইতে পারি।

যুগরেখা অঙ্কন করিয়া শিক্ষার্থীদের মনে সময়ের সুস্পষ্ট ধারণা জন্মান যায়।

'গ্রাফ' কাগজে অঙ্কিত বংশ বা রাজ্যের উত্থানপতনের রেখা অধ্যয়নেচ্ছুদের নিকট মূল্যবান হয়। ছাত্রগণ উহা চর্চ্চা করিতে পারে।

সর্ব্বদা বুঝাইবার সুবিধার জন্য একটি বৃহৎ ভুমণ্ডলের গোলক থাকাও প্রয়োজন।

ইতিহাস প্রকোষ্ঠে বিভিন্ন যুগের সংগৃহিত মুদ্রা ও বিভিন্ন দেশের মুদ্রা কৌতূহল বর্দ্ধিত করে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলের পয়সা সহজপ্রাপ্য—অথচ আমাদের ছাত্ররা উহা দেখে নাই।

ছাত্রদের প্রস্তুত বিভিন্ন যুগের মাটির জিনিস একটি প্রদর্শনী টেবিলের উপর থাকিতে পারে। ইহার সুবিধা এই ছাত্রগণের প্রস্তুত করিবার সঙ্গে সঙ্গে নিজদের সুস্পষ্ট ধারণা জন্মে এবং প্রকোষ্ঠটির সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করে।

প্রকোষ্ঠটির এক কোণায় কাঁচি, আঠা, কাগজ, ছুরি প্রভৃতি সজ্জিত থাকিতে পারে। প্রয়োজনমত শিক্ষার্থীরা উহা ব্যবহার করিতে পারে।

নিম্নশ্রেণীতে ছাত্রদের সহস্তে অঙ্কিত ছবির সাহায্যে এবং প্রকারে কথোপকথনের মাধ্যমে জ্ঞানবৃদ্ধি করা যায়। পাশ্চাত্য দেশে এ পরীক্ষা সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। স্বাধীন চিন্তাসম্পন্ন ব্যক্তি নিজেই তাহার অনুসরণীয় পন্থার সন্ধান পাইবেন।

অষ্টম অধ্যায়

ইতিহাসের সহিত বিষয়ান্তরের পারম্পর্য্যস্থাপন

ইতিহাসের সহিত অন্যান্য বিষয়ের সম্বন্ধ স্থাপন পূর্ব্বক ইতিহাস অধ্যাপনা অনেকের মতে সুফলপ্রদ হয়।

আধুনিক শিক্ষাজগতে ইতিহাস ভূগোল প্রভৃতিকে একত্র করিয়া "সোশ্যাল ষ্টাডিজ" সামাজিক পারিপার্শ্বিকের শিক্ষা, নাম দিয়া ইতিহাস ভূগোলের এবং পৌর নীতি সমন্বয়ে এক পাঠ্যসূচি প্রবর্ত্তনের কথা হইয়াছে। কাহারও মতে ইহাতে বিশেষ বিষয়ে দক্ষতা বা পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জ্জন করা কষ্টকর হইয়া পড়ে।

সম্বন্ধ স্থাপন পূর্ব্বক ইতিহাস অধ্যাপনা দ্বারা শিক্ষক ছাত্রকে ইহা স্পষ্টতঃ বুঝাইতে পারেন যে সমগ্র জ্ঞানের মূলসূত্র একত্র গ্রথিত এবং জ্ঞান ভাণ্ডার পরস্পরের সহিত অন্বিত।

আমরা পূর্ব্বে এক অধ্যায়ে এই প্রসঙ্গে আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছি যে বিজ্ঞানের সহিত ইতিহাসের কোনও সম্পর্ক না থাকিলেও ইতিহাস পড়াইতে গিয়া বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ইতিহাস পড়ান প্রয়োজন হয়।

সম্বন্ধ স্থাপনকে অনেকে ঐতিহাসিক দুই ভাগে বিভক্ত করেন—

১। আকস্মিক এবং ২। শৃঙ্খলাগত।

আকস্মিক সম্বন্ধ স্থাপন বিষয়ে পাঠদান করিতে গেলে আপনা হইতেই প্রসঙ্গক্রমে যে সমস্ত বিষয় পর পর আসিয়া পড়ে তাহাই তো আকস্মিক। শিক্ষক হয় তো প্রাগ ঐতিহাসিক যুগের কাহিনী পড়াইতে-ছেন, তখন তাহার মনে পড়িল কোনও বাংলা কবিতার ছন্দ। বুঝিলেন ঐ কাহিনীটি উদ্ধৃত করিলে বিষয়টি একেবারে পরিষ্কার হইবে। তিনি তাহার উল্লেখও করিলেন। উহা হইল আকস্মিক।

শিক্ষক বিষয়টি পড়াইতে গিয়া নির্দ্দিষ্ট পন্থায় বিষয়ান্তরের সহিত সম্পর্ক খুঁজিয়া বেড়াইবেন তখনই হইবে উহা শৃঙ্খলাবগত। শিবাজীর

ইতিহাস পড়াইতে গিয়া শিক্ষক যখন শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে শিবাজী কাব্য হইতে উদ্ধৃত করিয়া পরিচিতি দিবেন বা শিক্ষার্থীদের পড়িয়া শুনাইবেন তখন হইবে শৃঙ্খলাবদ্ধ সম্বন্ধ স্থাপন। শিক্ষক পড়াইতেছেন সম্রাট ঔরঙ্গজীবের দাক্ষিণাত্য বিজয় কাহিনী তিনি যখন মানচিত্র বা ভৌগলিক অবস্থান প্রভৃতির ব্যাখ্যা করিলেন তখনই তিনি বিষয়ান্তরের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং পারম্পর্য্য স্থাপন করিলেন। এই প্রকার সম্বন্ধ স্থাপনের বিষয়ে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই উহা—পূর্ব্ব পরিকল্পিত এবং সুচিন্তিত হয়। আকস্মিক সংযোগ স্থাপনে ইহা থাকে না। অনেক সময় ইহা লক্ষ্য করা যায় যে এই সংযোগস্থাপন করিতে গিয়া মূল বিষয়কে হালকা করা হয় বা বিষয়ান্তরের প্রাধান্য দেওয়া হয়। ইহাও ভাল নহে। এই প্রকার সম্পৃক্ত করণে অনেক সময় বিষয় বিশেষজ্ঞ শিক্ষক হয়তো সঠিকরূপে অন্য বিষয়টি উপস্থাপন করিতে পারেন না। তখন বিষয় বিশেষজ্ঞ শিক্ষকের কাজ হইবে তাঁহার সহকর্ম্মীদের অনুরোধ করা এবং শিক্ষার্থীদের বলিবেন যে নির্দ্দিষ্ট বিষয়টি ঐ বিষয় বিশেষজ্ঞ শিক্ষক অধ্যাপনা করিবেন। বিষয়ান্তরকে অনাদর না করিয়া যতদূর সম্ভব এইপ্রকার সম্পর্কিত পাঠদান সুফলপ্রদ হয়।

ইতিহাসকে সাধারণতঃ সাহিত্য, ভূগোল এবং হাতের কাজ দ্বারা বিষয়ান্তরের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করা হয়।

আমরা প্রথমতঃ সাহিত্যের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন বিষয়ে আলোচনা করিব। এই বিষয়ে ইতিহাস শিক্ষকগণের দুইটি পরস্পর বিরোধী মত বিদ্যমান। একদল বলেন ইতিহাসতো গাথা, উপকথা, কাহিনী, যুগযুগান্তরের বার্ত্তা লইয়াই রচিত। অতএব ইতিহাস সাহিত্য। উহার শিক্ষাপ্রসঙ্গে সাহিত্যের কথা তো উঠিবেই—কেননা ইতিহাস সাহিত্যই।

অপর দল বলেন ইতিহাস মোটেই সাহিত্য নহে—বিজ্ঞান। বৈজ্ঞানিক যেমন অনুপরমানুকে অনুসন্ধান করিয়া বাহির করেন, ইতিহাসের শিক্ষার্থীর কাজও কি সেই বৈজ্ঞানিকের মত সত্যকে অনুসন্ধান

করা নহে ? ইতিহাসতো উপকথা নহে—উহা পরম সত্যের সন্ধান। উহা বিজ্ঞান। উহার সহিত সাহিত্যের বাকচাতুর্য্য, ভাষার আড়ম্বর, রূপছন্দ প্রভৃতির কথা উঠিতেই পারে না।

উভয় মতই—দুই প্রান্তের মত। মাঝামাঝি পথই ধরিতে হইবে। সাহিত্যকে ইতিহাসের অঙ্গ হইতে একেবারে বাদ দিলে চলিবে কেন ? মহাভারত সাহিত্য—কিন্তু তাহার একটি ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি আছে। তাহার মধ্যে ইতিহাসের সন্ধান মিলেনা-কি ? দ্রৌপদীর বিবাহে সমাগত রাজন্যবর্গের মধ্য হইতে তদানীন্তন ভারতের রাষ্ট্রসমূহের কাহিনীর ইতিহাস মিলে না কি ? আমাদের শিক্ষার্থীগণ উপন্যাস পড়েনাকি ? প্রাচীন শিক্ষকগণ অনেকেই হয়তো মনে করিতে পারিবেন যে তাহাদের বাল্যকালে ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের লিখিত 'কাঞ্চনমালা' ঐতিহাসিক উপন্যাস হিসাবে কি গভীর আগ্রহের সহিত তদানীন্তন ছাত্রগণ অধ্যয়ন করিত। কেবল উপন্যাসই নহে। ঐতিহাসিফ নাটক যেমন শাহজাহান, মেবার পতন এগুলি যেমন চিত্তাকর্ষক তেমনি কল্পনাময়। বাংলা কাব্য জগতে পলাশীর যুদ্ধ, শিবাজী কাব্য, পৃথ্বীরাজ কাব্য ; অমূল্য ঐতিহাসিক সাহিত্য। কিন্তু এই সমস্ত সাহিত্যের ভিতর মূল লক্ষ্য করিতে হইবে যে ইতিহাস যেন অবাস্তবের পর্য্যায়ে না দাঁড়ায়। কোনও কোনও সাহিত্য এত বেশী কল্পনা বহুল যে উহা ইতিহাস হইতে বহুদূরে সরিয়া গিয়াছে মনে হয়। ইহা সর্ব্বপ্রকারে রোধ করা দরকার। এই সব সাহিত্যের ক্ষেত্রে ইতিহাস শিক্ষককে এই কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে তিনি উহা কেবল কল্পনার সূত্র হিসাবে ছাত্রদের নিকট উপস্থাপিত করিতেছেন —উহা "উত্তাপের মূলমন্ত্র—আলো নহে"।

এইবার আমরা ভূগোল প্রসঙ্গে আসিব।

অনেকে বলেন প্রাকৃতিক অবস্থান এবং সম্পদ যুগে যুগে দেশের এবং জনসাধারণের ইতিহাসের গতি ঠিক করিয়াছে এই মতবাদীদের মত প্রাকৃতিক অবস্থান, বিপর্য্যয়, গতি, প্রাকৃতিক ছন্দ

হইতেছে—সকলের মূল। ইহা হইতেই আসিয়াছে, ধর্ম্ম, কৃষ্টি, যুদ্ধ। ভারতের আর্য্যগণের প্রকৃতির উপাসনা ইহা হইতেই উদ্ভুত, ইসলামের—ধর্ম্মপ্রচার ও প্রাকৃতিক অবস্থার জন্য—মরুভূমি হইতে দেশদেশান্তরের শস্যশ্যামল ধনসম্পদের সন্ধানে প্রচার। এ মতবাদ গ্রহণ করিলে ইতিহাসের তো কোনও স্বকীয় অস্তিত্ব থাকেনা—ভূগোলই প্রধান হইয়া দাঁড়ায়।

কিন্তু এই মতবাদ সত্য কি ?

মানুষ কি সত্যই প্রকৃতির হাতে ক্রীড়নক মাত্র ? যুগে যুগে মানুষ কি প্রকৃতিকে জয় করার চেষ্টা করে নাই, দেশ দেশান্তরে প্রকৃতিকে জয় করিবার জন্য ছুটিয়া বেড়ায় নাই ? মানুষ কি প্রকৃতিকে বন্ধন করিবার জল—খাল, নদী, কাটায় নাই, বাঁধের সৃষ্টি করে নাই ? প্রকৃতির হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য—গৃহ নির্ম্মাণ করে নাই ? প্রকৃতিকে দাস বানাইবার চেষ্টা করে নাই ? বর্ত্তমান রাশিয়াতে কি বরফাবৃত ভুমিকে শস্যশ্যামল প্রান্তরে পরিণত করে নাই ? ভারতবর্ষেও কি দামোদর বাঁধের সৃষ্টি হয় নাই ? অতএব একমাত্র প্রকৃতিই নিয়ন্ত্রণ করেনা—মানুষও নিয়ন্ত্রণ করে যুগের কাহিনী। এই মানুষের কাহিনীই ইতিহাসের কাহিনী—এবং তাহার সহিত প্রকৃতির প্রয়োজনমত সম্বন্ধ সৃজনই ভুগোলের সহিত সম্পৃক্ত রাখিয়া ইতিহাস অধ্যাপনা। মেসিডনের দিগ্বিজয়ী বাহিনী প্রকৃতিকে জয় করিয়াই অগ্রসর হয়। শিবাজীর সৈন্যদলও প্রকৃতিকে উপেক্ষা করিয়াই—মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিদ্বন্দ্বি হইয়া দাঁড়ায়।

ইতিহাস শিক্ষককে সর্ব্বদাই ভূগোলের সাহায্যে ইতিহাস পড়ান ভাল। তিনি ভুগোলের মানচিত্র দেখাইয়া যুগে যুগে জাতির ভারতে আগমনের পথ, বৈদেশিক আক্রমণ, সৈন্যদলের গতিবিধি সবই বুঝাইতে পরেন।

ভূগোলও ইতিহাসের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। আমেরিকার ভুগোল পড়াইতে গিয়া কি ইতিহাসকে বাদ দিলে চলে ?

ইতিহাসের সহিত পৌরশিক্ষারও আধুনিক শিক্ষকগণ সম্বন্ধস্থাপন করেন।

ম্যাজিক লণ্ঠন, ফিল্ম প্রজেক্টার, প্রভৃতি আধুনিক যুগে ইতিহাসের সহিত বিষয়ান্তরের সম্বন্ধ স্থাপনে সাহায্য করে। শিক্ষার্থিগণ চিত্রপ্রদর্শনি হইতে কি প্রকার আনন্দ উপভোগ করে—এবং শিক্ষা পায়—তাহা শিক্ষকমাত্রই জানেন। শিক্ষার্থিগণ চিত্র দেখিতে দেখিতে যখন অতীতের পরিচ্ছদ, পরিবেশ, প্রভৃতি দেখে তখন তাহাদের মন অতীতেই চলিয়া যায় এবং সে শিক্ষা হয় প্রানবন্ত। বেতার সাহায্যেও আধুনিক ইতিহাসের শিক্ষাধারার পরিবর্ত্তন আনা হইতেছে। ইতিহাসের প্রধান শিক্ষকগণ বেতার সাহায্যে ইতিহাসের মূল্যবান জ্ঞানদান করিতে পারেন।

ভবিষ্যৎ পাঠস্থচির মধ্যে ইতিহাসকে (Social Studies) সামাজিক পরিপার্শ্বিকের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। এর পাঠ্যতালিকায় ইতিহাসের অবতারণা করা হইয়াছে—নিম্নলিখিত ধারায়। স্থানীয় সমাজে বাস, অতীতের সমাজে বাসসংস্থা, আধুনিক জগতের সমাজসংস্থা, আধুনিক সমাজে বাস-সমস্যা, বর্ত্তমান জগত কি প্রকারে গড়িয়া উঠিল, ভারতের সভ্যতা কি প্রকারে পাশ্চাত্যকে প্রভাবান্বিত করিল, বর্ত্তমান ভারতে বাস প্রভৃতি। অবএব দেখা যাইতেছে হয়তো আমাদের বর্ত্তমান ইতিহাসের ধারা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তন হইবে। হয়তো তখন বিষয়ান্তরের-সহিত সম্বন্ধ স্থাপন প্রশ্ন তেমন তীব্র থাকিবেনা।

নবম অধ্যায়

ইতিহাস শিক্ষক

ইতিহাস শিক্ষক কি প্রকার হইবে ইহা একটি প্রশ্ন বটে।

শিক্ষক যেমন হয় তেমনি এই উত্তর পাইলেই কি আমরা সন্তুষ্ট হইতে পারি ?

ইতিহাস শিক্ষকের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয় গুণ—তাঁহার জ্ঞানের গভীরতা থাকা আবশ্যক। শিক্ষা ও জ্ঞান একই বস্তু নয়। শিক্ষার গভীরতা হইতেই প্রকৃত জ্ঞান আসে। প্রকৃত জ্ঞানী যিনি তিনি মূল উৎসের সহিত সুপরিচিত, তিনি কোথায় কি ভাবে জ্ঞানের প্রয়োগ করিতে হইবে তাহার সহিত পরিচিত এবং তাঁহার শিক্ষাদানের গণ্ডীর সম্বন্ধও সুপরিচিত। তিনি সন্ধান রাখেন ইতিহাসের ঘটনার আবর্ত্ত কি ছন্দে চলে এবং ইতিহাস কি সত্যি পুনরাবৃত্তি না ঘটনার সমাবেশ।

ইতিহাস শিক্ষককে শিক্ষণবিষয়ে ও শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতে হইবে এই কথা বলাই বাহুল্য। ইতিহাস তো মানুষেরই জীবন সম্বন্ধে—অতএব ইতিহাস শিক্ষককে মানব দরদী এবং প্রকৃত মনুষ্য ধর্ম্ম সম্পন্ন হইতে হইবে যাহাতে তিনি শিক্ষার্থীদের নিকট উপযুক্ত দরদ দিয়া ইতিহাসকে উপস্থাপিত করিতে পারেন। ইতিহাস শিক্ষকের এ তত্ব সম্বন্ধেও জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

ইতিহাস শিক্ষককে বিস্তৃতি পরিধি সংযুক্ত কৃষ্টির অধিকারি হইতে হইবে। তিনি মনুষ্যের যুগ-যুগান্তরের কৃষ্টির সন্ধান ও প্রেরণা দিবেন শিক্ষার্থিকে। অতএব তাঁহাকে অতীত এবং বর্ত্তমানের কৃষ্টিধারার সহিত সুপরিচিত হইতে হইবে।

ইতিহাসের শিক্ষক যদি শিল্পী বা চারুশিল্পের রুচিসম্পন্ন হন তবে তাঁহার শিক্ষা প্রদান মনোজ্ঞতর হয়।

তাঁহার নিজের যদি গবেষণা থাকে বা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থাকে

—ঐতিহাসিক স্থান দর্শনের, খননের বা প্রত্নতত্ত্বের তবে উহা গুণের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করে।

ইতিহাসের শিক্ষককে সত্যনিষ্ঠ হইতে হইবে। তিনি সত্যকে মিথ্যার ক্ষুদ্রতম বিন্দু হইতেও খুঁজিয়া বাহির করিবেন এবং তাঁহার বিবরণীর মধ্যে থাকিবে একান্ত নিখুঁত সত্য (accuracy), যদি তিনি কোনও বিষয় না জানেন তবে তাহাও সত্যনিষ্ঠ ভাবে স্বীকার করিবেন।

মহৎ কার্য্যের জন্য তাঁহার থাকিবে প্রচুর উৎসাহ—কেন না তিনিই তো বিশ্বের মহান কার্য্যাবলির ইতিহাস প্রচার করিবেন। তাঁহার প্রচার এবং কার্য্যে সঙ্গতি থাকা প্রয়োজন।

ভ্রমনের অভিজ্ঞতা ইতিহাস শিক্ষকের আর একটি প্রয়োজনীয় গুন।

তাঁহার থাকিবে সততা, নিষ্ঠা, শান্ত, ধীরস্থির ভাব, স্থিতধী বিচার বুদ্ধি এবং মনুষ্য জীবনের বৈচিত্রময় কাহিনীর যথোপযুক্ত প্রশংসা।

তাঁহার মনুষ্যে বিশ্বাস থাকা প্রয়োজন এবং রসজ্ঞানও (appreciation) থাকা প্রয়োজন। শিশুদের প্রতি তাঁহার থাকিবে সত্যিকার দরদ।

ইতিহাস শিক্ষক যদি অন্ধ বিশ্বাসী হন—তাহা হইলে তাঁহার উপর ইতিহাস শিক্ষার ভার অর্পণ করা আদৌ উচিত নহে।

ইতিহাস শিক্ষক কি দেশপ্রেমের বাণী বা প্রেরণা ছাত্রদিগকে দিবেন? এই সম্বন্ধে বহু বাদানুবাদ হইয়াছে। যাঁহারা ইতিহাস শিক্ষকদ্বারা দেশপ্রেমের বাণী প্রচার করিতে চাহেন তাঁহারা বলেন ইতিহাস শিক্ষক যখন অতীতের বীরদের কাহিনী বলিবেন তখন তিনি এমন আবেগময়ী ভাষায় বর্ণনা দিবেন, বীরকে এমন করিয়া চিত্রিত করিবেন যেন তাহা হইতেই ছাত্রগণ পায় অনুপ্রেরণা।

অপর পক্ষ বলেন—ইতিহাসকে ক্ষুদ্র জাতীয়তার গণ্ডীতে আবদ্ধ রাখিতে গিয়া ইতিহাসের প্রকৃত রূপকে বিনষ্ট করা হইয়াছে। ইতিহাস উদার দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখিতে পারে নাই তাই ইতিহাস হইয়াছে বিকৃত। জগতের চারদিকে আজ দেখা দিয়াছে বিশ্বজনীনতা। বিশ্বের কল্যাণ কামনা-বোধ মানুষকে আজ পথ দেখাইবে। তাহাই যদি হয় তবে

ইতিহাসকে জাতীয়তা বোধের উন্মেষক হিসাবে প্রয়োগ করা ঠিক নহে। ইতিহাস শিক্ষক সত্যনিষ্ঠ হইবেন এবং যেটুকু সত্য সেইটুই কেবল তাহার ছাত্রের সম্মুখে দেখাইবেন এবং ছাত্রকেও সত্যকে চিনিতে শিখাইবেন—তবেই ইতিহাস শিক্ষা স্বার্থক হয়। জাতিয়তা বোধ জাগ্রত করিবার উদ্দেশ্যে বা দেশপ্রেমের উন্মেষণ দিবার উদ্দেশ্যে অনেক সময় ইতিহাসকে বিবৃত করা হয়। ইহা বাঞ্ছনীয় নহে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি ইতিহাস শিক্ষক হইবেন বৈচিত্রপ্রয়াসী এবং বৈচিত্র-উন্মুখ।

দশম অধ্যায়

ইতিহাস পরীক্ষা

পরীক্ষা কথাটির অর্থ গুন, যোগ্যতা, পরিমাণ, যথার্থ্য ইত্যাদির বিচার, ছাত্রের বিদ্যাবত্তা নির্ণয় করা। চলন্তিকা কথাটির এইরূপ সংজ্ঞা দিয়াছে। পরীক্ষা সম্বন্ধে জগতে এত বেশী আন্দোলন হইয়াছে যে পরীক্ষা যদি কোনও জীব হইত তাহা হইলে পুনঃপুনঃ ছিন্ন করার পর তাহার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া যাইত।

পরীক্ষার সম্বন্ধে বাদানুবাদ এ অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় নহে। পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না—সর্ব্বত্রই যদি যোগ্যতার মাপকাঠির প্রয়োজন হয় ভবিষ্যৎ ছাত্র নাগরিকের পক্ষে উহা প্রযোজ্য হইবে না কেন? তবে এই কথা বলা যাইতে পারে যে পরীক্ষার ধারা পরিবর্ত্তিত হওয়া প্রয়োজন, ইহা অধিকতর সমস্যামূলক হওয়া প্রয়োজন। ইতিহাস পরীক্ষাক্ষেত্রে ইহা আরও অধিক মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করার বিষয়। ইহার পুনর্বিন্যাস এবং পুনর্গঠন প্রয়োজন।

পরীক্ষার লক্ষ্য কি হওয়া উচিত?

পরীক্ষার প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত ছাত্রদিগকে যেন অধীতব্য বিষয়েই পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। অধ্যাপনা পন্থা অনুসারেই পরীক্ষা গ্রহণ করা উচিত। বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন ভাবে পড়ান যায়। সেই পঠন প্রণালীর ধারাও অনুসৃত হওয়া উচিত। নিম্নস্তরে ছাত্র ছাত্রিগণকে কথাবার্ত্তার মাধ্যমে ইতিহাস শিক্ষা দেওয়া হয়। অতএব এই স্তরের পরীক্ষা মৌখিক হওয়াই বাঞ্ছণীয়। অপেক্ষাকৃত বড়দের পরীক্ষায় লিখিত হইলেও ছোট ছোট প্রশ্ন দেওয়াই ভাল। এই স্থানে আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করার আছে। সর্ব্ব নিম্নস্তরে হয়তো ইতিহাসের ধারার ক্রম অনুসারে পড়ান হয় না—কিন্তু তাহার উপরের শ্রেণীতে তো অনবচ্ছেদ

অনুসারেই পড়ান হয় না। অতএব উর্দ্ধের দুইটি স্তরে অনবচ্ছেদের ধারা অনুসারেই প্রশ্নপত্র রচিত হওয়া উচিত।

। সর্ব্ব স্তরেই যুগরেখার প্রতি লক্ষ্য রাখা হইয়াছে এবং সময় জ্ঞান জন্মাইবার জন্য চেষ্টাও হইয়াছে। অতএব পরীক্ষার সময় এই বিষয়টিও লক্ষ্য রাখিয়া প্রশ্নপত্র রচনা করিলে ভাল হয়। এই সমস্ত আলোচনা হইতে ইহা স্পষ্ট বুঝা যায় যে অধ্যাপনার ধারা অনুসারে যদি প্রশ্নপত্র গঠিত করা যায় তবে পরীক্ষার বিষয়ে তেমন আপত্তি হইবার কোনও কারণ থাকে না।

তাহা হইলে পরীক্ষাকে যদি আমরা একটি সাধারণ কর্ম্মসূচীর পর্য্যায়ে ফেলি, যদি আমরা উহাকে অত্যাবশ্যকীয় মনে না করি যে আমাদের বিদ্যালয় জীবনের গতানুগতিক পন্থার একটি অবিচ্ছিন্ন ধারা মাত্র—বৎসরের শেষে একটা সালতামামির হিসাব তো ভীতিকর কিছু নহে—তবে তো পরীক্ষার প্রতি আমাদের তেমন বিরাগও থাকে না। পরীক্ষা শিক্ষার একটি অঙ্গমাত্র এবং পুনরালোচনো বলা যায়। অভিজ্ঞ শিক্ষক জানেন যে প্রতিদিন প্রতিপদে তিনি এই পুনরালোচনা সর্ব্বদাই করেন। ইতিহাস পড়াইতে গিয়া বারবার অতীতের সঙ্গে সংযোগস্থাপন করিতে হয়, বারবার অধীত বিষয়ের প্রসঙ্গ অবতারণা করিতে হয়—ইহা ছাত্রদের ঠিক মনে আছে কিনা প্রশ্ন করিয়া জানিতে হয়। প্রতিদিন এই পরীক্ষা চলে। অতএব পরীক্ষা যদি দৈনন্দিনই চলে—তবে তাহা এমন ভয়ের কি ?

কিন্তু তবুও আমরা ভয় করি কারণ পরীক্ষাকে আমরা একটা গুরু গম্ভীর পর্য্যায়ে সজ্জিত করিয়া রাখি। পরীক্ষার হাস্যকর চিত্রটি আরম্ভ হয় তখন যখন দেখা যায় শিক্ষক মহাশয়গণ গম্ভীর মুখে প্রশ্নপত্র রচনা আরম্ভ করেন এবং ইহার চূড়ান্ত হয় তখন যখন দেখা যায় পরীক্ষায় পাশ তথা উচ্চতর শ্রেণীতে উন্নীত হওয়ার জন্য ছাত্রগণ দৌড়াদৌড়ি করিতেছে। আমরা পরীক্ষামন্দিরে শিক্ষকগণের গুরু গম্ভীর পদবিক্ষেপ দেখি, আর দেখি ছাত্রদের দুর্গাপূজার নবমীর জন্য জীববিশেষের ন্যায় কম্পমান তবুও গাম্ভীর্য্য ভাঙ্গা চলে না।

এই অবস্থার প্রতিকার কি ?

(ক) একটিমাত্র বাৎসরিক পরীক্ষার উপর ফলাফল নির্ভর না করিয়া বৎসর ধরিয়া ছাত্রছাত্রী যে পাঠ করিল তাহার একটা হিসাবের উপরে উচ্চ শ্রেণীতে উন্নতির বিষয়ে সুযোগ দেওয়া ভাল।

(খ) যিনি অধ্যাপনা করিবেন তিনিই পরীক্ষকগণের একজন থাকিবেন—ইহাতে ছাত্রগণের পরীক্ষার ধারা বুঝিতে সুবিধা হইবে। অধ্যাপক ব্যতিরেকে অন্য কেহ প্রশ্ন করিলে নূতন ধারায় প্রশ্ন হইতে পারে এবং পরীক্ষার্থীগণের অসুবিধার সম্ভাবনা।

(গ) উচ্চতর শ্রেণীতে উন্নীত করা মাত্র এক সপ্তাহের ফলাফলের উপর নির্ভর করে। সম্বৎসরের পরিশ্রমের কোন মূল্যই দেওয়া হয় না। ইতিহাসের বিষয়ে এই কথা বলা যায় যে ইহার পাঠ্য বিষয় এত বহুল যে কেবলমাত্র একটি পরীক্ষা এবং কয়েকটি দিনের স্মৃতির উপর ইতিহাসের ফলাফল নির্ভর করা অধিকতর বিপজ্জনক।

(ঘ) ইদানীং অনেক উৎকৃষ্ট বিদ্যালয়ে সাপ্তাহিক পরীক্ষার পুনঃপ্রবর্ত্তন করা হইয়াছে। ইতিহাস বিষয়ে এরূপ পরীক্ষা সুফলপ্রদ হয়।

(ঙ) মধ্য এবং উচ্চস্তরে শিক্ষার্থীদের রচনামূলক ঐতিহাসিক নিবন্ধ লিখিতে দেওয়া এবং উহার উপর একটি বৃত্তি দেওয়া উচিত।

(চ) নিবন্ধমূলক দীর্ঘ-উত্তর প্রশ্নের উত্তর দাবি না করিয়া প্রশ্নে ছাত্রদের বোধশক্তি এবং বিচার নির্ধারক ক্ষুদ্রতর প্রশ্নের উত্তর চাহিলে ভাল হয়।

রচনা বা নিবন্ধমূলক প্রশ্ন সম্বন্ধে বিগত বারবৎসর পর্য্যন্ত নানাপ্রকার আলোচনা হইয়াছে। বর্ত্তমানেও বহুদর্শী এবং শিক্ষাবিদ উহার নব রূপায়ণে চেষ্টা করিতেছেন। এই সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা শিক্ষার্থীগণ পরীক্ষা সংক্রান্ত বিষয় অধ্যয়ণ কালে পাঠ করেন। অতএব আমরা এখানে কেবলমাত্র ইতিহাসের সংশ্লিষ্ট অংশটুকু আলোচনা করিব।

ইতিহাস পরীক্ষার প্রবন্ধাকারে উত্তর লিখিবার প্রয়োজনীয়তা আছে বৈ কি। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রশ্নে কেবল তো কয়েকটি ঘটনার স্মৃতিমাত্র পরীক্ষা করা যায়। কিন্তু ঐতিহাসিকের পক্ষে প্রয়োজন, হয় যুক্তির সারবত্তা, ঐতিহাসিক চিন্তা, ঘটনার তাৎপর্য্য এবং অন্বয়। ইতিহাসের ছাত্রকে বিচার করিতে হয় স্বকীয় চিন্তাধারা অনুসরণ করিয়া ইতিহাসের ঘটনার কার্য্যকারণ প্রভৃতি অনুসরণ করা। চিন্তাধারা অনুসারেই তো লেখকের ধারা নিয়ন্ত্রিত হয়। বস্তু না থাকিলে দ্রব্য গড়া যায় না। ইতিহাসের ছাত্রকে তাই নিজস্ব ধারায় চিন্তা করিতে হয়, চিন্তাধারাকে সুসংবদ্ধ করিতে হয় এবং যোগ্যরূপে তাহা প্রকাশ করিতে হয়। এজন্য ইতিহাসের ছাত্রকে প্রবন্ধমূলক প্রশ্ন করার প্রয়োজন। উহা না দিলে তাহার পড়ার উদ্দেশ্যই তো ব্যর্থ হইয়া গেল।

যাঁহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রশ্নের পক্ষপাতি তাঁহারা বলিবেন—প্রবন্ধমূলক প্রশ্নের জবাব ছাত্রগণ সহজে মুখস্থ করিয়া ফেলে এবং পরীক্ষায় তাহাকে লিখিয়া বৈতরণী অতিক্রম করিবার চেষ্টা করে। ইহার উত্তরে এই কথা বলা যায় যে পরীক্ষার্থীগণকে মামুলি ধরণের প্রশ্ন না করিয়া একটু চিন্তাপ্রসূত প্রশ্নদ্বারাইতো ইহা এড়ান যায়। আমরা সাধারণতঃ ছাত্রদিগকে প্রশ্ন করি পলাশীর যুদ্ধের কারণ বা সিপাহী বিদ্রোহের কারণ অথবা রণজিৎসিংহের জীবনী লিখ। এইরূপে প্রশ্ন না করিয়া যদি আমরা ছাত্রদের প্রশ্ন করি যে সিরাজ-উ-দ্দৌল্লা বিদেশী বণিকদের পছন্দ করিলেন না কেন এবং কি ভাবে তাহাদের সহিত মতানৈক্য হইল।—তাহা লিখ, তাহা হইলে বোধ হয় একেবারে মুখস্থ লিখিতে পারে না। যে কোনও বিষয়ের মধ্যস্থল হইতেই প্রশ্ন দিলে—এবং ঘটনার পারম্পর্য্য

রক্ষা করিয়া লিখিতে বলিলেই ছাত্রগণ মুখস্থ লিখিতে পারে না।

যেহেতু শিক্ষকগণ এরূপ ধরণের প্রশ্ন করিতে পারেন না অথবা—যেহেতু শিক্ষকগণ ঐভাবে অধ্যাপনা করিতে পারেন না—এজন্য প্রবন্ধ মূলক প্রশ্ন দেওয়া হইবে না—এ যুক্তি দুর্ব্বলতার পরিচায়ক। একটা দেশ বা জাতি এই দুর্ব্বলতার প্রশ্রয় দিলে গড়িয়া উঠিতে পারে না।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে প্রশ্ন হইবে বিভিন্ন ধরণের। নিম্নে কতিপয় দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে।

নূতন প্রশ্নমালা

পাশ্চাত্য দেশের শিক্ষাবিদগণ প্রশ্নমালার গবেষণামূলক নবরূপ দিবার চেষ্টা করিতেছেন। এই প্রশ্নমালার বিশেষত্ব—এইগুলি সাধারণতঃ হয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র।

(ক) সত্যমিথ্যা বিচারমূলক প্রশ্ন—একই ধরণের প্রশ্নে দুইটি কথা থাকে—ইহার মধ্য হইতে প্রকৃত উত্তরটিকে বাছাই করিয়া তাহার পাশে নির্দ্দেশক চিহ্ন দিতে হয়।

গৌতম বুদ্ধদেব উরুবিল্ব সারনাথ নামক স্থানে সিদ্ধিলাভ করেন।

(খ) গুণিতক প্রশ্ন হইতে উত্তর নির্দ্ধারণ

(i) চরিত্র নির্দ্ধারক একটি প্রশ্নের উত্তর—কয়েকটি দেওয়া থাকিবে—তাহার মধ্য হইতে একটিকে বাছাই করা।

উদাহরণ—সম্রাট আকবর, চঞ্চল, বিদ্বান, ধর্ম্মান্ধ, উদার ছিলেন।

(ii) সময় নির্দ্ধারক

(iii) ঘটনার নির্দ্ধারক

(vi) বিচারমূলক

(গ) সম্পূরক প্রশ্ন—

শিবাজীর পিতার নাম......এবং মাতার নাম......।

(ঘ) যথাযোগ্য উত্তর নির্ধারণমূলক প্রশ্ন পাশাপাশি কয়েকটি প্রশ্ন ও কয়েকটি উত্তর থাকে। উহা হইতে বাছাই কর।

সম্রাট অশোক	প্রয়াগে মহাসম্মিলন আহ্বান করিলেন।
সম্রাট হর্ষবর্দ্ধন	উত্তর ভারতের বহুরাজ্য জয় করেন কিন্তু দাক্ষিণাত্যে বাধা পান।
সমুদ্রগুপ্ত	ভারতের বাহিরে ও বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার করেন।

(ঙ) যুগজ্ঞান পরীক্ষা। (ইতিহাসের কালক্রম অনুসারে সাজান)

ঔরঙ্গজীব,
অশোক,
শিবাজী
হর্ষবর্দ্ধন
লক্ষ্মণসেন।

এই সমস্ত পরিপ্রেক্ষিতে আমরা নূতন প্রণালীর সম্বন্ধে বলিতে পারি যে উহা দ্বারা দ্রুত গতিতে বহু বিষয়ে পরীক্ষা করা চলে, পরীক্ষার্থীর বুদ্ধি, বিচার শক্তি, যুগ-জ্ঞান প্রভৃতি পরীক্ষা করা যায়। খুব বেশী শিক্ষার প্রয়োজন হয় না কাগজ কালি কলম অপচয় হয় কিন্তু পরীক্ষার্থীর ভাষা জ্ঞানের কোনও পরীক্ষা হয় না এবং পরীক্ষকের ব্যক্তিগত মন ও মেজাজ পরিমাপ বিষয়ে কোনও প্রকার প্রভাবিত হইতে পারে না।

ইহার বিরুদ্ধে যুক্তি প্রধানতঃ নিম্নলিখিত প্রকার :—

(ক) প্রশ্নপত্র প্রস্তুত করা কষ্ট কর। যেহেতু শিক্ষকগণই উপযুক্ত নন তাহার জন্য কোনও ভাল চেষ্টা করা ঠিক হইবে না—এই কথা হাস্যস্কর। আর শিক্ষকগণ চেষ্টা করিলে পারিবেন না—এই কথাও তো মনে হয় না।

(খ) এপ্রকার প্রশ্নে পরীক্ষার্থীরা আন্দাজে উত্তর করার সুযোগ পায়। ইহাও ঠিক নহে—কেননা—তাহাতে ক্ষতিরই সম্ভাবনা।

(গ) এই প্রকার পরীক্ষা শেষ পর্য্যন্ত উপকারি হইবে কিনা

সন্দেহ কেননা ইহাতে বিচার শক্তি, ; চিন্তাধারা, বুদ্ধিবৃত্তির কোনও ক্ষেত্র থাকে না।

আমরা তাহা মনে করি না। প্রবন্ধমূলক প্রশ্নতো থাকিবেই। আমরা সর্ব্বমিশ্রিত প্রশ্নপত্র রচনা করার কথাই বারংবার উল্লেখ করিয়াছি।

প্রভবমূলক প্রশ্ন।

এই রকম প্রশ্নে মূল উৎস সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হয়। কিন্তু আমাদের ভারতবর্ষের ইতিহাসের মূল অধ্যায় মুদ্রা, অনুশীলন, পুরাতন সৌধ পরীক্ষা এই সমস্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রদের পক্ষে কঠিন হইয়া পড়ে। পরীক্ষা ক্ষেত্রে এই সমস্ত বিচার করার মত সময়ও থাকে না।

স্যালিসব্যারি পরীক্ষা

ইতিহাসের শিক্ষা ও পরীক্ষা বিষয়ে আধুনিক জগতে বহু প্রকার গবেষনা চলিতেছে। স্যালিসব্যারির একটি বিদ্যালয়ের প্রবীণ শিক্ষক মিঃ হারোল্ড এই বিষয়ে অনুসন্ধানকার্য্য চালাইতেছেন।

তাঁহার মনে প্রথমতঃ এই প্রশ্নই জাগে যে ইতিহাসে এত স্মৃতিশক্তিরই পরীক্ষা যদি ঠিক হয়—তবে অধ্যয়নশীলদের বিচারবুদ্ধি ও যুক্তিপ্রবণতা কিপ্রকারে বৃদ্ধি পাইবে। তিনি বলিলেন পরীক্ষার্থীদের ঐতিহাসিক উপাদান হইতে ইতিহাস তথ্য অনুসন্ধানই শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত। স্মৃতিশক্তির পরীক্ষাতো উদ্দেশ্য নহে। তিনি এই বিষয় যে গবেষণা করিলেন তাহা কতকটা নিম্নলিখিত প্রকার।

ইতিহাসের কাগজ তিন ভাগে ভাগ করা হয়। তাহার মধ্যে একটি অংশ থাকে ইতিহাসের মূল উৎস সম্বন্ধে। এই অংশে থাকে তারিখ, খণ্ডবিক্ষিপ্ত ঘটনার বিবরণ, ঐতিহাসিক গ্রন্থমালার উদ্ধৃতাংশ প্রভৃতি। পরীক্ষার্থীকে ঐ সমস্ত বিক্ষিপ্ত অংশ হইতে ইতিহাস সংগ্রহ করিয়া উত্তর দাঁড় করাইতে হয়। এই পন্থায় ছাত্রকে চিন্তাশীল হইতে হয়। এবং ইতিহাস সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হইতে হয় অথচ তাহার মগজকে অতিরিক্ত উপাদানে ভারাক্রান্ত করিতে

হয়না। আর এই পন্থায় শিক্ষককেও কেবল মুখস্থ আদায় করিবার জন্য নিযুক্ত থাকিতে হয়না পরন্তু তিনি ছাত্রকে নূতন নূতন পন্থায় ইতিহাসের জ্ঞান আহরণ করিবার সুযোগ দিতে পারেন। ইহাই ঐতিহাসিকদের প্রকৃত পন্থা এবং এখানেই ইতিহাসকে প্রকৃত বিজ্ঞান সম্মত পন্থা বলা যায়।

ইহার পরে প্রশ্ন আসে—বিভিন্ন স্তরে কি ধরণের প্রশ্ন করা উচিত। আমাদের উল্লিখিত আলোচনায় বিভিন্ন স্তরের কথাও উল্লেখ করা হইয়াছে। আমরা বিশ্বাস করি আমাদের শিক্ষকগণ স্বকীয় বুদ্ধি দ্বারা এইবার প্রশ্নপত্র রচনা করিতে পারিবেন। আমরা সংক্ষেপে তিনটি স্তরের প্রশ্নপন্থা পাশাপাশি দেখাইতেছি।

নিম্নস্তর	মধ্যস্তর	উচ্চস্তর
১। ছোট ছোট উত্তর সম্পন্ন প্রশ্ন।	১। ছোট ছোট উত্তর মূলক প্রশ্ন।	১। সময় এবং যুগ সম্বন্ধীয়।
২। সম্পূরক বা যথাযোগ্য উত্তরমূলক প্রশ্ন।	২। নূতন পরীক্ষার প্রশ্ন।	২। আধুনিক সমস্যায় সজ্জিত অতীতের সামঞ্জস্যমূলক প্রশ্ন।
৩। তারিখ এবং যুগ সম্বন্ধীয়।	৩। সময় এবং যুগ সম্বন্ধে প্রশ্ন।	৩। প্রবন্ধমূলক প্রশ্ন।
৪। খুব ছোট ছোট গল্প।	৪। প্রবন্ধমূলক প্রশ্ন সরল, সহজ।	৪। মানচিত্র সম্বন্ধীয় প্রশ্নও বহিঃরেখা—অঙ্কিত করিয়া দিতে হইবে। পরীক্ষার্থীগণ উহাতে অভিযান পথ আবিষ্কার পন্থা, রাজ্য বিস্তার প্রভৃতি দেখাইবে।
	৫। মানচিত্র সম্বন্ধীয়—রাজ্য বিজয়, ধর্ম্মবিস্তার	৫। মধ্যস্তরের (১) ধরনের প্রশ্ন।
	৬। কতগুলি উদ্ধৃত ঐতিহাসিক তথ্য হইতে উহার কারণ নির্দ্ধারণ করিয়া শিক্ষার্থিকে দিতে হইবে।	৬। তুলনামূলক—বিভিন্ন ইতিহাসের যুগরেখা।

একাদশ অধ্যায়

প্রভব পন্থা

(The Source method)

ইতিহাস বাস্তব ঘটনা সম্বলিত কাহিনী। ঐতিহাসিক যাহাই লিখিবেন তাহার মূলে থাকিবে সত্য। আমরা এইজন্য পূর্ব্বেই বারংবার বলিয়াছি যে প্রকৃত ঐতিহাসিক সত্যদ্রষ্ট্য ঋষি। বিন্দুমাত্রও মিথ্যা যদি কোনও ঘটনায় প্রবেশ করে—তবে আর তাহার ইতিহাস সংজ্ঞা থাকেনা। ইহাই ইতিহাসের প্রকৃত রূপ। ঐতিহাসিককে মিথ্যা হইতে সর্ব্বদাই সত্যকে বিশ্লেষণ করিয়া বাহির করিতে হয়। যখন ঐতিহাসিক তাহা করেন, তখন তিনি বৈজ্ঞানিক পন্থা অবলম্বন করিলেন তিনি বৈজ্ঞানিক। ইতিহাস হয় বিজ্ঞান।

এই প্রকার উপাদান বা মূল উৎস অথবা 'প্রভব'কে অনুসরণ কষ্টকর হয়। তবুও আমরা বলিব ইহাই একমাত্র উপায়। যুগযুগান্তরের বিস্মৃতপ্রায় ঘটনা বা কাহিনী হইতে তথ্য বাহির করা কষ্টকরই বটে—কিন্তু নান্যপন্থা বিদ্যতে।

নৃতত্ত্ববিদগণ ইতিহাসের এই 'প্রভব' অনুসরণকে প্রধানতঃ নিম্নলিখিত পন্থায় বলিয়াছেন :—

প্রাগ-ঐতিহাসিক যুগ অনুসরণ।

ভারতের অতীত ইতিহাসের যে সূত্র মহেঞ্জোদাড়ো, হরপ্পা প্রভৃতি স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে—তাহার তথ্য প্রায় অন্ধকারেই আছে বলা যায়। আমাদের সে সময়কার ইতিহাস অনুসরণ করিবার একমাত্র উপায় তদানীন্তন যুগের আবাস গৃহ, পয়ঃপ্রণালী, বিভিন্ন চিত্র, যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র প্রভৃতি হইতে সেই যুগের ইতিহাসের তথ্য নির্ধারণ। স্বাধীন ভারতে আরও অনেক নূতন নূতন স্থানে প্রাগ-ঐতিহাসিক সূত্রের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। এই সমস্ত স্থানের

কোনও বিবরণইতো আমরা পাইনা—কেননা লিখিত কিছু আমাদের হাতে পৌছায় নাই। মাথার খুলি, হাড়পাজড়া, ধ্বংশাবশেষ এই সবই আমাদের লক্ষ্য থাকে। আবার এই সমস্ত বিষয়ের প্রত্যেকটির থাকেন আব্যর বিশেষজ্ঞ। যিনি গৃহবিদ্যাবিশারদ, তিনি হয়তো আসবাবপত্রের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে কিছু বলিতে পারিবেন না, আবার যিনি মুদ্রা বিশেষজ্ঞ, তিনি হয়তো চিত্র বিশেষজ্ঞ হইরেন না। ঐতিহাসিকের কাজ এই সমস্ত বিশেষজ্ঞদের 'প্রভব' সম্বন্ধে মূল ব্যাখ্যা গ্রহণ করিয়া—ইতিহাসের ধারার অনুসন্ধান করা। এই সমস্ত কার্য্যে ঐতিহাসিককে ধীর স্থির প্রশান্ত ও নিরুদ্বেগ চিত্তে অগ্রসর হইতে হয়। তিনি যদি বিন্দুমাত্রও সত্যের পথ হইতে সরিয়া গেলেন বা তাঁহার মনে যদি বিন্দুমাত্রও আবেগ বা পক্ষপাতিত্ব প্রবেশ করে, তিনি আর সত্যদ্রষ্টা থাকিতে পারেন না। তিনি সৃজনীশক্তি বিশিষ্ট সংগ্রাহক এবং সংগঠক না হইলে ইতিহাসের মূল তত্ত্ব অনুসরণ করিতে পারিবেন না। তাঁহার কল্পনাশক্তি তাঁহাকে অতীতের দূর দূরান্তের অধ্যায়ে পরিচালনা করিবে এবং তিনি সেখান হইতে বাহির করিবেন সেই যুগে লোকদের জীবন যাত্রা প্রণালী, সমাজের কথা, জাতীয় জীবনের কথা, বিশ্বের সহিত সংযোগের কথা। ঐতিহাসিক যখন দেখেন সুমাত্রা, যাভা, বর্ণিয়ো প্রভৃতি অঞ্চলে ভারতীয় জীবনযাত্রার ছবি—তখন তাঁহার পক্ষে যোগসূত্র স্থাপন করা কষ্টকর হয় না। তিনি হইবেন কল্পনাপ্রবণ কবি এবং ধৈর্য্য এবং সূক্ষতাও যথার্থতা নির্দ্ধারক বৈজ্ঞানিক।

কিন্তু ইতিহাস কি সর্ব্বদা তাহাই হয়?

আমাদের ভারতবর্ষের রামায়ণ, মহাভারত হইতে আরম্ভ করি। মূল মহাভারত বা রামায়ণের কাহিনী হইতে কত পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন সম্প্রসারন হইয়াছে। ঐতিহাসিক গিবন লিখিলেন রোমক সাম্রাজ্যের ইতিহাস। তাঁহার ধারা পরবর্ত্তিগণ অক্ষুন্ন রাখিলেন না। একদল লোক ইতিহাসকে জনপ্রিয় করিবার জন্য ঐতিহাসিক ঘটনার সহিত

রক্তমাংসের যোজনা করিয়া চিত্তাকর্ষক কাহিনী রচনা করিলেন। পরবর্ত্তিগণ তাহার সহিত আরও সংযোজনা করিয়া রচনা করিলেন পাঠ্য পুস্তক। ঐতিহাসিক সত্য প্রায় বিলুপ্ত হইতে চলিল। ঐ প্রকারে যে কাহিনী রচিত হইল—তাহাকে ইতিহাস আখ্যা দেওয়া হইল—কিন্তু মূল মাল-মসল্লাকে রূপান্তরিত করিয়া চুণকাম করিয়া পরিবর্তিত কায় করা হইল। শিক্ষার্থীগণ পাইল 'প্রস্তুত মাল'—কিন্তু বিকৃত দ্রব্য। ইতিহাসের প্রকৃত রূপ ক্রমিক ধারা অনুসরণ, তাহাতে হারাইয়া গেল। হয়তো বা সামাজিক ইতিহাস ও কৃষ্টিগত ইতিহাসও বিলুপ্ত হইল রাজনীতির প্রাবল্যে। এই প্রকারে—ইতিহাসের মূল বা উৎস শেষপর্যন্ত আর অনুসৃত হইল না।

প্রাচীন যুগের ইতিহাসের উৎস সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। এইবার আমাদের আধুনিক যুগের ইতিহাসের মূলসূত্র সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি।

আমাদের ভারতবর্ষের ইতিহাসে আলেকজাণ্ডারের আক্রমনের পরবর্ত্তি যুগ হইতে 'ঐতিহাসিক যুগ' বলিয়া ধরা যায়। প্রকৃতপক্ষে এই যুগের ইতিহাস ও তো গ্রীকগণের লিখিত বিবরণ হইতে খণ্ডবিক্ষিপ্ত যে সংগ্রহ করা হইয়াছে—তাহাই হইল আমাদের ইতিহাসের উপাদান। ইহার পরবর্ত্তিকাল হইতেই আমরা পাই, তাম্রফলক, সমসাময়িক বিবরণী, আত্মজীবনী, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের ন্যায় পুস্তক, রাজাদের আদেশপত্র, দলিল, প্রভৃতি।

চিত্র, প্রস্তরমূর্ত্তি, সৌধাবলির ধ্বংসাবশেষও বহু প্রাচীন ইতিহাসের সন্ধান সূত্র সহায়ক। ঐতিহাসিক মাত্রই জানেন যে অজন্তা, ইলোরার চিত্র, কনিষ্কের প্রস্তর মূর্ত্তি, অশোকচক্র কি প্রকারে ইতিহাসের উৎসের সন্ধান দেয়।

অতীত ইতিহাসের এবং বর্ত্তমানের ইতিহাসেও অনুশাসন একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। সম্রাট অশোকের অনুশাসন এবং

সমুদ্রগুপ্তের অনুশাসন ঐতিহাসিক কত উপাদানের সন্ধান দিয়াছে তাহা সকলেই জানেন।

আমাদের দেশের উপেক্ষিত দলিল প্রভৃতিরও ঐতিহাসিক মূল্য আছে।

এইবার প্রশ্ন দাঁড়ায় ছাত্রগণকে ইতিহাসের মূলসূত্র বা উৎসের সহিত পরিচয় করাইতে হইবে কি?

এই সম্বন্ধে ইতিহাসের শিক্ষকগণ দুইটি বিভিন্ন মত পোষন করেন।

একদল বলেন "আমাদের মধ্য বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীগণ অপরিপক্ক। তাহারা মূল উৎস পড়িলেও তাহার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে না। কেবল পরিশ্রমই সার হইবে। তাহাছাড়া মূল্যবান দলিল কাগজ প্রভৃতিও নষ্ট করিয়া ফেলিবে।"

বিরুদ্ধবাদীগণ বলেন "যেহেতু ছাত্রগণ বুঝিবেনা পূর্ব্ব হইতেই সিদ্ধান্ত করিয়া রাখা হইয়াছে এইজন্য তাহারা পড়িবারও সুযোগ পাইবে না একথা বলা ঠিক নহে। চেষ্টাটার ও একটা গৌরব আছে। আমাদের বিদ্যালয় সমূহে সম্প্রতি বিজ্ঞানের জন্য লেবরেটরির বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। পূর্ব্বে ইহা কল্পনার ও অতীত ছিল। শিক্ষার্থীগণ ইতিহাসের মূল উৎসের সহিত পরিচয় হইবার চেষ্টাটাই তো ফলপ্রদ, ইহাতেই তো তাহাদের মনে প্রকৃত ঐতিহাসিকের দৃষ্টিবোধ জন্মাইবে এবং উত্তরকালে বৃহত্তর ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধানে সহায়ক হইবে।"

আমরা শেষোক্ত কথাটিরই সমর্থন করি। ইতিহাসের শিক্ষক এই পন্থা অনুকরণ করিবেন কারণ—

(ক) ইহাতে ছাত্রদের অন্তঃকরণ ইতিহাসের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন করে।

(খ) তাহার পাঠদানকে পূর্ণাঙ্গ দেওয়া যাইতে পারে।

(গ) বিভিন্ন মতের প্রাধান্যের মধ্য হইতে ইতিহাসের তথ্য বাহির করিতে ছাত্রগণ শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতে পারে।

পুস্তক বা দলিল ছাড়াও শিক্ষক ছাত্রকে ইতিহাসের স্মৃতি বিজড়িত

স্থান সমূহ প্রমোদ পরিদর্শনে লইয়া গিয়া মূল উৎসের সহিত পরিচিত করাইতে পারেন। আমাদের বাংলা দেশের ছাত্রগণ পলাশীর রণক্ষেত্র ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ, নব আবিষ্কৃত বেড়াচাঁপা প্রভৃতি স্থানে পরিভ্রমণে গিয়া ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধান পাইতে পারে।

কলিকাতা যাদুঘরে বা আশুতোষ মিউজিয়াম পরিদর্শন করিলে ছাত্রগণ কত ঐতিহাসিক তথ্যের মূল উৎসের সহিত পরিচিত হইতে পারে।

ইতিহাস শিক্ষকের শিক্ষাদানের ইহা অপরিহার্য্য অঙ্গ। মূল উৎসের সহিত পরিচিত হইলে ছাত্রগণ ইতিহাস বিষয়ে অধিকতর উৎসাহ সম্পন্ন হইবে।

দ্বাদশ অধ্যায়

ইতিহাসে যুগজ্ঞান

ইতিহাস অতীতকে লইয়া কাজ করে।

আমরা ভূমিকায় বলিয়াছি ইতিহাসের কাজ অতীতের সেই যুগের তমিস্রা ভেদ করিয়া পরম সত্যকে বাহির করা।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কথা দিয়াই আরম্ভ করি

"কথা কও, কথা কও,
অনাদি অতীত অনন্ত রাতে
কেন চেয়ে ব'সে রও?...
তুমি জীবনের পাতায় পাতায়
অদৃশ্য লিপি দিয়া
পিতামহদের কাহিনী লিখিছ
মজ্জায় মিশাইয়া—।
যাহাদের কথা ভুলেছে সবাই
তুমি তাহাদের কিছু ভোলো নাই,
বিস্মৃত যত নীরব কাহিনী—
স্তম্ভিত হ'য়ে রও।
ভাষা দাও তারে, হে মুনী অতীত
কথা কও, কথা কও॥"

অতীত তো কাহিনী পরিপূর্ণ। অতএব অতীতের ইতিহাস অনুসন্ধান সেই সময়ের কর্ম্ম-চঞ্চল নর-নারীর কাহিনীর অনুধাবন। তাহা হইলে দেখা যায় ইতিহাসের ধারা পরিক্রমায় সর্বপ্রথমে আমাদের লক্ষ্য হইতেছে—জীবন—তাহার পর যুগ এবং পরিব্যাপ্তি।

দেখা যাইতেছে ইতিহাস সময়কে অনুসরণ করে। তাহা হইলে ইতিহাস শিক্ষার্থীর পক্ষে সময় বা যুগজ্ঞান থাকা একান্ত প্রয়োজন।

আমাদের শিশুদের সময় সম্বন্ধে বাল্যকাল হইতেই একটা মোটামুটি জ্ঞান থাকে। ইহা কি স্বজ্ঞা (intuition) না অণুমা (inference) আমরা যদি যুগ বা সময়কে জীবন হইতে সম্পূর্ণ পৃথকরূপে কল্পনা না করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের যুগজ্ঞান নিশ্চয়ই এমন একটি মানসিক অবস্থা যাহাতে আমরা জীবনকে অন্যান্য পরিবেষ্টনাদির সহিত গ্রথিত করিয়া কল্পনা করি, অনুমান করি। তাহা হইলে ইহা একান্তরূপেই অণুমা, স্বজ্ঞা নহে।

আমাদের এই অনুমার মধ্যে থাকে পরিব্যাপ্তি, দূরত্ব বোধ এবং যথাস্থান নির্দ্ধারণ।

আমরা জানিতে চাহি যে ঐতিহাসিক ঘটনাবলির আবর্ত্তন কতকাল ব্যাপিয়া চলে। এই স্থানে আমরা সময়ের দৈর্ঘ্য পরিমাপ করিতে ইচ্ছা করি।

ঘটনার পরিব্যাপ্তি জানিতে পারিলে স্বতঃই আমাদের মনে প্রশ্ন আসে—ইহা আমাদের বর্ত্তমান কাল হইতে কতদিন পূর্বে সংঘটিত হয়েছে —অর্থাৎ আমাদের বর্ত্তমানের সহিত ইহার সম্পর্ক কতটুকু।

তারপর আমরা কি সঞ্চার পথ সম্বন্ধেও জানিতে চাই? আমরা কি একটি ঐতিহাসিক ঘটনার সহিত অপরটির পারম্পর্য্য জানিতে চাই? ঐতিহাসিক যাঁহারা তাঁহারা সকলেই স্বীকার করিবেন যে অধ্যায়নকালীন একটি নির্দ্দিষ্ট ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া অপরটির সহিত তাহাতে সময়ের ব্যবধান বা যুগ তারতম্য প্রদর্শন করিলে শিক্ষার্থীরা অধিক আনন্দ পায়। এই যে যুগরেখার জ্ঞান ইহা কেবলমাত্র নির্দ্দিষ্ট তারিখ বা ঘটনা লইয়া নহে। এই যুগরেখা তৎকালীন চারিদিকের অবস্থা পরিস্থিতির বিশেষত্বের সহিত অপর আবর্তকালীন বিষয়ের তারতম্য রেখা। ইতিহাস শিক্ষকের কার্য্য প্রধান প্রধান ঘটনাবলির সহিত যুগরেখার সংযোগ স্থাপন ও যুগতারতম্য প্রদর্শন। আমরা যখন ভারতবর্ষের ইতিহাসে শেরশাহর কথা পড়ি, তখন স্বভাবতঃ তাঁহার সময়ের সামাজিক, কৃষ্টিমূলক এবং অর্থ নৈতিক

অবস্থার সহিত আকবর বা শিবাজীর যুগের আবেষ্টনীর তারতম্য স্থাপন করিতে সচেষ্ট হই। আমরা তখন তারিখটা বা বৎসরটা বা ব্যাপ্তিটাই বড় করিয়া দেখিনা ; আমরা দেখি তৎকালীন কৃষ্টিটাই। ইতিহাস এজন্যই রাজনৈতিক বিষয় নহে, কেবলমাত্র ঘটনাবলির আবেশ নহে, উহা দেশের তৎকালীন সামাজিক অবস্থার বর্ণনা।

মানুষের জীবন জটিলতা পরিপূর্ণ। সমাজের বা দেশের কথা অধিকতর জটাজালে পরিবৃত। ইতিহাসের পরিক্রমার পথে আমরা নির্দ্দিষ্ট অংশ বাছাই করিয়া তৎকালীন সমাজ, ধর্ম্ম, নীতি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতির সহিত অন্যান্যের সম্পর্ক স্থাপন করাইয়া দেখাইতে পারি। আমরা আর্য্য সভ্যতার ক্রমবিকাশের ধারাকে অনুসরণ করিয়া গুপ্তদের স্বর্ণ যুগের সহিত তুলনা করিতে পারি। ইতিহাস শিক্ষককে সর্ব্বদা এই কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে কত গুলি নির্দ্দিষ্ট তারিখ বা সময় লইয়া তাঁহার কাজ নহে—তাঁহার কাজ ঘটনা পরিবেশ লইয়া।

তাহার পর আসে ব্যাপ্তির প্রশ্ন। আমরা তারিখ বা সময় লইয়া অনেক সময় অকারণ মস্তিষ্ককে বিব্রত করি। বাস্তবিক পক্ষে কত দীর্ঘ কাল ধরিয়া এক একটী বিশেষ বিশেষ ঘটনার আবর্ত্ত চলে তাহা গভীর ভাবে উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করি না। সম্রাট অশোকের শাসন কালের, তাঁহার ধর্ম্মপ্রচারের কথা পড়ি বা পড়াই কিন্তু আমরা ইতিহাস শিক্ষকরূপে ছাত্রদের সম্মুখে কখনও এই কথা বুঝাইতে চেষ্টা করিনা যে কত বৎসর চেষ্টার ফলে ধর্ম্মপ্রচার পূর্ণতা লাভ করে বা আমরা এই কথাও বুঝাইতে চেষ্টা করিনা যে বৌদ্ধ ধর্ম্ম কত দীর্ঘকাল ধরিয়া জগতে প্রচার লাভ করিয়া আসিয়াছে। শের শাহের শাসনকাল পড়াই কিন্তু মাত্র পাঁচ বৎসর পরিব্যাপ্ত তাঁহার কর্ম্মময় জীবনের সহিত আকবরের দীর্ঘকাল শাসনের পরিব্যাপ্তির তুলনা করি কি ? ঐতিহাসিক ছাত্রকে দেখাইতে পারেন দিল্লীর সুলতানদিগের দীর্ঘকাল শাসনের তুলনায় গুপ্ত যুগে কত অল্প সময় পরিব্যাপ্তিতে চারিদিকে দেখা দেয় বহুমুখী উন্নতি।

আমাদের ইতিহাস থাকে তারিখ-বহুল। আমরা ছাত্রদের জন্য এত ঘন ঘন তারিখ সন্নিবিষ্ট পাঠ্যপুস্তক রচনা করি যে অধ্যয়নেচ্ছুগণ তারিখ সম্বন্ধে রীতিমত বিরক্তিকর মন্তব্য করে। ফলে তাহারা তারিখ মনে রাখিতে চেষ্টাও করেনা। আবার কেহ কেহ বলেন,—ইতিহাসে আবার তারিখ জানার কি প্রয়োজন? উভয় মতের কোনওটিই গ্রাহ্য নহে। আমাদের কয়েকটী বিশেষ তারিখ স্মরণ রাখিতে হইবে বই কি? এই সমস্ত ঘটনা পরস্পরের সম্পর্কবন্ধনও গ্রথিত করিতে হইবে। ইহাই ইতিহাসের উদ্দেশ্য। শ্রেণীতে অধ্যপনা কালে সর্ব্বদাই এইকথা স্মরণ রাখিতে হইবে।

কিপ্রকারে বিভিন্ন প্রকারে সময় জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া যায়—তাহার আলোচনা করা হইতেছে।

চাক্ষুষ সহায়ক যুগ-রেখা—ইহার সুবিধা এই ছাত্রগণকে ঐতিহাসিক সময় নির্দ্ধারণে ইহা একটী ছবির মত প্রতিভাত হয়। অপরের সহিত আলোচ্য ঐতিহাসিক ঘটনার কাল সুস্পষ্টরূপে দৃশ্যমান হয়। ইহা ঠিক ঘটনা সময় কাল মধ্যে পরস্পরের সময় বাহির করিতে সুবিধা হয়। ইহা সম্মুখে রাখিয়া ঘটনা সমূহের পুনরাবৃত্তি করিতে ছাত্রগণের সুবিধা হয়।

যুগরেখা সম্বন্ধে একদল ঐতিহাসিক বলেন বার বৎসরের নিম্নে শিক্ষার্থীদের নিকট ইহা মনোজ্ঞ হয়না, অপর দল বলেন যে কোনও শ্রেণীর বা বয়সের ছাত্রের নিকট ইহা চমকপ্রদ হয়। একদল বলেন ইহা শিক্ষক বা ছাত্র যে কেহ অঙ্কিত করিলেই হইল—অন্য শিক্ষাবিদগণ বলেন না ছাত্রগণ অঙ্কিত না করিলে ইহা সুফলদায়ক হইবে না। লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে যুগরেখা যেন আকারে অন্ততঃ দুই তিন ফিট হয়। ঘন ঘন এবং খুব বেশী তারিখ বসাইলেও যুগরেখার মাধুর্য্য নষ্ট হয়। কোনও কোনও শিক্ষক কেবলমাত্র একজন রাজা বা শাসকের যুগকে কেন্দ্র করিয়া যুগ-রেখা টানিয়া দেখান। ইহাতে ঠিক যুগজ্ঞান হয় না। কালের রেখা যত দীর্ঘ সময় ব্যাপিয়া দেখান যায়—ততই ভাল হয়। ঐতিহাসিক

আন্দোলন, ধর্ম্ম আন্দোলন, জাতীয় আন্দোলন প্রভৃতিও যুগরেখা সাহায্যে স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়।

লেখ (Graph) লেখ সাহায্যে ও ঐতিহাসিক ঘটনাবলির আবর্ত্তন স্পষ্টরূপে বুঝান যায়। আমরা লেখ সাহায্যে প্রাচীন ভা[illegible] ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম, বৌদ্ধ ধর্ম্মকে পাশাপাশি দেখাইয়া উত্থান নিষ্কর্ম্ম যুগ [illegible] অঙ্কিত করিতে পারি। এই প্রকারে আমরা দিল্লী এবং মুঘলদের রাজত্বকালকে ও লেখ সাহায্যে বুঝাইতে পারি।

যুগরেখা বা লেখ সম্বন্ধে অনেকের মত এই অধ্যয়নেচ্ছুগণ এই সমস্ত অঙ্কনে এত বেশী সময় অপচয় করে যে মুল শিক্ষা তাহাতে ব্যাহত হয়। এজন্য কোনও শিক্ষক পূর্ব্ব অঙ্কিত রেখার উপর ছাত্রদের শিক্ষাদেন। এই সমস্ত রেখা অনেক সময় দোকানে পাওয়া যায়। আমাদের দেশে এখনও ইহা প্রস্তুত হয় নাই।

ইতিহাস শিক্ষা-প্রদানে অভিনয়ের স্থান

Dramatisation in History

মানবমাত্রই অনুকরণ প্রিয়। শিশু-ও। শিশু যখন বড় হয়, তখন অতীতের বস্তু বা কল্পনাকে নূতন নূতন ভাবে সাজাইয়া তাহা অনুকরণ করিতে ভালবাসে। শিশুর এই অনুকরণের মূলে থাকে তাহার অহংবুদ্ধি, ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষা, তাহার বড় হইবার আগ্রহ। যেন যেন (Make believe) খেলার মধ্যে তাহার অহর্নিশ তৃপ্তি পায় জীবনে সন্ধান পায় সাফল্যের। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের শিশুবীরের ডাকাতের সঙ্গে লড়াই এই কল্পনারই সৃষ্টি এবং অভিনয়। শিশুর যত বয়স বাড়িতে থাকে, ততই তাহার কল্পনার বৈচিত্র্যও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে। শিশুর এই কল্পনাকে কেন্দ্র করিয়া খেলার মধ্য দিয়া শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা শিক্ষকের একটি কর্তব্য। শিশুর কল্পনাকে গঠনাত্মক পন্থা পরিচালনা করিতে হইলে—শিশুকে অভিনয় সাহায্যে ইতিহাস শিক্ষা প্রদান একটি অপরিহার্য অঙ্গ মনে হয়। সম্রাট অশোক, সমুদ্রগুপ্ত, আকবর, শাহজাহান, সিরাজ-উ-দ্দৌলা এই সমস্ত ভূমিকায় শিশু অভিনয় করিবার সঙ্গে সঙ্গে কল্পনার নেত্রে তাঁহাদের গুরুদায়িত্ব, কর্তব্য ভাব, চরিত্রবল প্রভৃতির প্রকৃত সত্তাও উপলব্ধি করিবে।

অনেকের মতে কিশোর বয়সে ইতিহাস শিক্ষা প্রদানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পন্থা হইতেছে অভিনয় মাধ্যমে।

অধিকাংশ শিশু কিশোরই একদিকে যেমন নিজেরা অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করিতে ভালবাসে, অপর দিকে তেমনি অপরের অভিনয় করা এবং তাহার অঙ্গভঙ্গি লক্ষ্য করিতে ভালবাসে।

অভিনয়ের আর একটি মনস্তাত্ত্বিক লাভ এই শিশুর থাকে শক্তির প্রাচুর্য্য। মানসিক বা দৈহিক শক্তির প্রাচুর্য্যে ভরা শিশু সর্ব্বদাই তাহার ব্যঞ্জনা দিবার জন্য, বিকাশের জন্য পন্থা খুঁজিয়া বেড়ায়। অভিনয় শিশুর এই দৈহিক এবং মানসিক উভয় প্রকারে শক্তিরই ব্যঞ্জনার দ্বার খুলিয়া দেয়। সকলেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন অভিনয়ের নামে তরুণ কিশোর কি প্রকার অকাতরে দৈহিক পরিশ্রমে রত হয়। ষ্টেজ বাঁধার যোগাড়, সিনটাঙ্গান, দর্শকদের বসিবার স্থান

সাজান, প্রত্যেকটি কার্য্যের ভিতরে একদিকে যেমন শিশুর শারীরিক শক্তির পায় ব্যঞ্জনার সুযোগ, অপরদিকে তেমনি তাহার মানসিক শক্তিরও চলে খেলা। আবার যখন অভিনয়েরই জন্য যাহার যাহার অংশ প্রস্তুতি চলিতে থাকে, বারংবার আবৃত্তির প্রচেষ্টা চলিতে থাকে, তখন শিশুর ইতিহাসের জ্ঞান কেবল সুস্পষ্টতরই হয় না—দৃঢ়তরও হইতে থাকে। "আমি যদি জন্ম নিতেম কালিদাসের কালে," কল্পনার সঙ্গে, অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে কিশোরের মন যেন বাস্তবিক অতীতের ইতিহাসের চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের যুগের সভায় চলিয়া যাইতে চাহে।

অভিনয় শিশুর ইতিহাসের জ্ঞানকে যে সুস্পষ্টতর করে ইহা পূর্বেও উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রাগ ঐতিহাসিক যুগের অভিনয় কালে কিশোররা যখন তদানীন্তন যুগের বেশভূষা পরিধান করে, তাহাদের মনই তখন কেবল অতীতে চলিয়া যায় না—তাহাদের ইতিহাসের জ্ঞানও সুদৃঢ় হইতে থাকে। তাহারা প্রত্যেকে যেন এক একজন প্রাগঐতিহাসিক যুগের মানবরূপে নিজকে দেখিতে পায়। তখন আর রহস্যাবৃত ঐ যুগকে কিশোরের নিকট কঠোর বলিয়া মনে হয় না।

পূর্বেই বলা হইয়াছে শিশু, কিশোর, তরুণ চাহে নিজকে প্রকাশ করিতে। এই বিষয়ে 'কুঁড়ি' কবিতাটি বড় চমৎকার। উদাস হইয়া আকুলগন্ধ কুড়ির ভিতরে থাকিয়া ভাবিতেছে—তাহার জীবন বুঝিবা অর্থহারা হইয়া গেল। উদগ্র হইয়া আছে সে নিজকে বিকাশের জন্য। অভিনয় শিশুকে এই পথের সন্ধান দেয়—শিশু যেন ইতিহাসের এই অভিনয় মাধ্যমে সেই শুভ প্রভাতের সন্ধান পায়, সে সকলের সাথে মিলিবার সুযোগ পায় এবং নিজের আশা আকাঙ্ক্ষাকেও মিলাইবার সুযোগ পায়। সে জীবনের 'সার্থকতা'র রূপ দেখিতে পায়। ইতিহাসের বিভিন্ন অংশের ভূমিকায় কিশোর তরুণ এই প্রকার নিজের জীবনকে সাফল্যময় মনে করে।

অভিনয় শিক্ষা দেয় সমবেত এবং সহযোগিতার কার্য। একদল শিক্ষক কিন্তু ইতিহাসের শিক্ষায় অভিনয়কে স্থান দিবার বিশেষ পক্ষপাতী নহেন। তাঁহাদের মতে অভিনয় করিতে গিয়া বা অভিনয়ের বিষয় সমূহ রচনা করিতে গিয়া যে কল্পনার আশ্রয় লইতে হইবে—উহা অনেক সময় মূল ঐতিহাসিক তথ্য হইতে হয়তো দূরে সরিয়া যাইবে হয়তো বা ঐতিহাসিক নিষ্ঠাও তাহাতে থাকিবে না। ইহার ফলে অভিনয় উপকার হইতে অপকারই করিবে বেশী।

এই যুক্তি যাহারা খণ্ডন করেন, তাহারা বলেন শিশু, কিশোর; তরুণের নিকট আমরা এখনই গভীর নিষ্ঠা প্রভৃতি কথার উত্থাপন করিয়া তাহাদিগকে ভারাক্রান্ত করি কেন? আমাদের মূল লক্ষ্য কি? আমাদের লক্ষ্য হইতেছে ইতিহাসের প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি। যদিই একটু অবান্তর জিনিস এই নাটকপ্রসঙ্গে আসিয়া পড়ে—তাহাতেই বা ক্ষতি কি? অভিনয়ের উপাদান রচনা করিতে গিয়া যে কল্পনার আশ্রয় লইতে হইল ভবিষ্যতে তাহাই হয়তো ঐতিহাসিক গবেষণার ক্ষেত্রে হইবে সহায়ক। আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। অভিনয় করিতে যে পরস্পরের সহযোগিতার একান্ত প্রয়োজন হয় এই কথা সকলেই বুঝেন বা জানেন। আমরা যখন এই অভিনয়ের পৃষ্ঠপোষকতা করি, তখন উহা আমাদের দেখিতে বা শুনিতে ভাল লাগে বলিয়া করি। শিশু, কিশোর, তরুণ এই অভিনয় মাধ্যমে যে কেবল পরস্পরের সহযোগিতামূলক কার্য্যের শিক্ষাপ্রাপ্তই হয় তাহাই নহে তাহাদের মনও প্রস্তুত হইতে থাকে বৃহত্তর সহযোগিতার ক্ষেত্রের জন্য। ভবিষ্যতে ইতিহাসের বৃহত্তর ক্ষেত্রে এই আবাদ করা মনকে অনেক ভাল কাজে লাগান যায়।

এইবার আমরা দেখিব ইতিহাসের কি ধরণের বিষয় এই অভিনয়ের জন্য দেওয়া যাইতে পারে। আমাদের প্রথমে লক্ষ্য রাখা দরকার যেন অভিনয় ঘন ঘন না হয়। অভিনয়ের বিষয়সমূহ সুনির্বাচিত হয়।

ছোট ছোট ঘটনা সম্বলিত কাহিনী লইয়া অভিনয় আরম্ভ করিলে ভাল হয়। এই বিষয়ে আমাদের দেশে অধিক প্রচলিত আলেকজাণ্ডারের ও পুরুর কাহিনী—অনেকেই অভিনয় করিয়া দেখিয়া থাকিবেন। চাণক্য ও চন্দ্রগুপ্তের কাহিনীও অনেকে অভিনয়ের উপাদান হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। এই প্রকারে ছোট ছোট কাহিনীর অভিনয় ভাল। দীর্ঘ কাহিনী কেবল যে একঘেয়েমি থাকে তাহা নহে—ইতিহাসের মাধুর্য্যই নষ্ট করে। এই কাহিনীর বিষয় শিক্ষার্থীরা নিজেরাও রচনা করিতে পারে—শিক্ষকের সহযোগিতার মাধ্যমে। শিক্ষক তাহাদিগকে প্রয়োজন মত সাহায্য করিবেন। বিষয় নির্বাচন হইয়া গেলে ছাত্ররাই যথাসম্ভব ঐতিহাসিক নিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ করিয়া কাহিনী বা সংলাপ রচনা করিয়া যাইবে।

আমরা নিম্নে ভারতবর্ষের ইতিহাসের কয়েকটি সূত্র অভিনয় হিসাবে বাছাই করিয়া দিতেছি:—

(১) সিন্ধুদেশীয় সভ্যতা প্রসঙ্গে অভিনয়—আধুনিক একটি কিশোর

যেন জাতিস্মর হইয়া পূর্বের জীবনের বিষয়ে বন্ধুর সহিত কথা বলিতেছে—বা বিভিন্ন অংশে অভিনয় করিতেছে।

(২) ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের সঙ্ঘতেও—বৌদ্ধধর্মের প্রচার বিষয়ে অভিনয়।

(৩) বুদ্ধদেবের গৃহত্যাগ, বৌদ্ধত্ব প্রাপ্তি, সারনাথে ধর্মপ্রচার, রাহুলের সহিত সাক্ষাৎ, রাজগৃহে অবস্থান, বিম্বিসারের দীক্ষা।

(৪) বুদ্ধদেব, জরথুষ্ট্র, কনফ্যুশিয়াশ—কথোপকথন।

(৫) কলিঙ্গ যুদ্ধ, অশোকের মত পরিবর্তন, বিভিন্ন স্থানে দূত প্রেরণ—রাজসভা হইতে বাণী।

(৬) সম্রাট অশোক ও সমুদ্রগুপ্তের জীবনের আদর্শ সম্বন্ধে, ক্ষুদ্র নাটিকা বা কথোপকথন।

(৭) প্রভাকর বর্দ্ধনের মৃত্যু, রাজ্যবর্দ্ধনের যুদ্ধ, হর্ষবর্দ্ধনের যুদ্ধ, রাজ্যশ্রীর সহিত সাক্ষাৎ, কনোজ এবং প্রয়াগের মেলা।

(৮) লক্ষ্মণ সেনের রাজসভা।

(৯) পৃথ্বীরাজ, জয়চন্দ্র, মহম্মদ ঘোরী।

(১০) রাজিয়া, তাঁর সভাসদ।

(১১) আলাউদ্দিন খলজী ও তাঁহার সেনাপতি—দাক্ষিণাত্য বিজয় কাহিনী।

(১২) মহম্মদ তুঘলকের সময়ের চারজন লোকের অভিনয়—তাহার খামখেয়ালির প্রসঙ্গে।

(১৩) তৈমুরের ভারত আক্রমণ অভিনয়।

(১৪) বাবর ও হুমায়ুনের মৃত্যুশয্যা।

(১৫) আকবরের রাজত্বের বিভিন্ন বিষয়ের অভিনয়।

(১৬) তাজমহল নির্মাণে শ্রমিকদের কথোপকথন।

(১৭) ঔরঙ্গজেব ও জাহানারার কথোপকথন।

(১৮) নাদির শাহের ভারত আক্রমণ বিষয়ে কাল্পনিক কথোপকথন।

(১৯) সিপাহী বিদ্রোহের কয়েকজন নেতার অংশ অভিনয়।

(২০) লর্ড ডালহৌসীর আমলের সংস্কার বিষয়ে তদানিন্তন যুগের কাল্পনিক কাহিনী।

এই প্রকার বহু অংশ ভারত ইতিহাস হইতে বাহির করিয়া অভিনয়ের জন্য নির্বাচন করা হইতে পারে।

মূল অংশ বা প্রভব হইতেও এই প্রকার অভিনয় সূত্র বাহির করা যায়।

কল্পনা করা হইল যে আমরা ওয়ারেন হেষ্টিংসের কতকগুলি চিঠির নকল পাইলাম। ঐ চিঠির মধ্যে ফুটিয়া উঠিবে হেষ্টিংসের চরিত্র,—এবং হেষ্টিংসের যুগের কয়েকটি চরিত্র। আমরা তাহা হইতেই অভিনয় প্রণয়ন করিয়া—অভিনয় করিতে পারি না-কি?

মাসিক বসুমতী পত্রিকায় রবার্ট ক্লাইভের কতগুলি চিঠির বঙ্গানুবাদ বাহির হইতেছে। ইতিহাস শিক্ষক ইচ্ছা করিলে অভিনয় বা কথোপকথন রচনায় ঐগুলি সম্পদরূপে ব্যবহার করিতে পারেন।

মূলকথা শিক্ষকের দৃষ্টি-ভঙ্গীর উপরই সমস্ত নির্ভর করে। তিনি যেমন ইচ্ছা করিবেন—তেমনই তো কাজে কাটাইতে পারেন।

এইবার আমরা দেখিব কি অবস্থায় অভিনয় আরম্ভ করা যায়।

একটি বিশেষ অংশ ছাত্রগণ বারংবার অধ্যয়ন করে। তারপর ছাত্রগণকে পঠিত বিষয় সম্বন্ধে—কথোপকথন লিখিতে বলা যাইতে পারে। এই কথোপকথন লিখিতে যথাসম্ভব ঐতিহাসিক ঘটনাবলি এবং চরিত্র অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে।

শাহজাহান পড়ান শেষ হইল। শিক্ষক দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের লিখিত নাটক হইতে কিছু অংশ ছাত্রদের পড়িয়া শুনাইলেন। ছাত্ররা নিজেরাই অভিনয়ের অংশ বাছিয়া লইয়া অভিনয় করিতে পারে।

আবার ইহাও দেখা যায় যে শিক্ষক নাটক হইতে অংশ বিশেষ পড়িয়া শুনাইলেন। শিক্ষার্থীগণ ঐতিহাসিক তথ্য তাহা হইতেই সন্ধানরত হইল। এই ক্ষেত্রে 'নাটক'—ইতিহাসের সূত্রস্বরূপ ধার্য করিবে। ইতিহাস ও অভিনয়ের সংযোগ স্থাপন ক্ষেত্রে ইহাই বোধ হয় শ্রেষ্ঠ পথ হইবে যে পাঠদানের পূর্ণতা প্রদান করিবার উদ্দেশ্যেই অভিনয়ের আশ্রয় গ্রহণ করা যায়। এই প্রকার পাঠদান প্রসঙ্গে শিক্ষক ইচ্ছা করিলে অভিনয় অংশ পড়ার পর শিক্ষার্থীদের নিকট ব্যক্তি বিশেষের চরিত্রের যে রূপ কথাবার্তার মাধ্যমে ফুটিয়া উঠে তাহার বিষয়েও প্রশ্ন করিতে পারেন।

ভারতবর্ষের ইতিহাসের কয়েকটি তথ্য

১। মাদ্রাজে প্রেসিডেন্সির বেলারি জেলায় একটি প্রাচীন প্রস্তরের অস্ত্রশস্ত্রের কারখানা আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহা হইতে অনুমিত হয় যে Neolithic যুগেও ভারতের অধিবাসিগণ একটি বিশেষ সভ্যতার অধিকারী ছিল। এই যুগের লোকেরা যে গুহায় বাস করিত তাহা চিত্রিত করিতে ভালবাসিত। এই সমস্ত চিত্রে প্রধানতঃ থাকিত শিকার এবং নৃত্যের দৃশ্য। তাহারা তাহাদের ব্যবহার-যোগ্য পাত্র সমূহও চিত্রিত করিত। তূলা এবং পশমের ব্যবহার জানিত। মৃতকে একটি বৃহৎ আধারে করিয়া সমাহিত করিত। ভারতের বিভিন্ন অংশেই নহে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে এই প্রকার সমাধি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

২। সম্ভবতঃ ইহাদের উত্তরাধিকারিগণই পরে বিভিন্ন ধাতুর ব্যবহার শিখিল। সাধারণতঃ ঐতিহাসিকদের মত এই, ঋগ্বেদের রচনার সময় লৌহ যুগের সভ্যতা ভারতে দেখা দিয়াছে। তাম্রযুগের সভ্যতার পর্যায়ে সিন্ধুদেশীয় সভ্যতাকে রাখা হইয়াছে।

৩। মহেঞ্জোদাড়ো কথাটির অর্থ মৃতদের স্তূপ। এই স্থানটি লারকান উপত্যকার সিন্ধুনদী এবং নারাখালের মধ্যবর্তী স্থানে। ইহার চারিপাশের স্থানকে এখনও 'সিন্ধুর-উদ্যান' বলা হয়। মনে হয় দিল্লীর ন্যায় এই স্থানেও যুগে যুগে গড়িয়া উঠিয়াছিল বিভিন্ন রাজ্য, রাজধানী ও সভ্যতা। শিব, শক্তি, যক্ষ, বৃক্ষ, প্রস্তর এবং প্রাণীর পূজা মহেঞ্জোদাড়োর সভ্যতার বিশেষত্ব।

৪। প্রশ্ন উঠিয়াছে যে সে সিন্ধুদেশীয় সভ্যতা কি পাশ্চাত্যকে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল কিংবা পাশ্চাত্য সভ্যতাই সিন্ধুদেশীয় সভ্যতাকে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল। উভয় পক্ষেই বহু যুক্তি বিদ্যমান।

৫। বৈদিক সভ্যতা কি সিন্ধুদেশীয় সভ্যতার পূর্বে বা পরে ইহাও একটি প্রশ্ন দাঁড়াইয়াছে। বেদে লৌহের উল্লেখ আছে দেখিয়া অনেকে মনে করেন—ইহার পরবর্তি যুগের সভ্যতা।

৬। সিন্ধু-সভ্যতার লোকেরা আর্য ছিলেন কিনা—একটি প্রশ্ন উঠিয়াছে। অনেকের মতে তাহারা ভিন্ন একটি সভ্যতা বা শ্রেণীর লোক ছিলেন।

৭। প্রাচীন ভারতে ইন্দ্র উপাসক জাতিসমূহ দুইটি প্রতিদ্বন্দ্বী জাতিতে বিভক্ত ছিলেন—ইহাদের একটির নাম ছিল 'ভরত' এর দল, অপরটির নাম ছিল যদু, তুর্বসু, দ্রুহ্য, অনু এবং পুরু। ইহা ছাড়াও আর একটি জাতি ছিল 'দাস' বা

সভ্যগণ। মনে হয় ভরত জাতি কালক্রমে ভারতে আধিপত্য স্থাপনা করে। তাহার অগ্নি উপাসক ছিল।

৮। ঋষিদের যুগেও রাজারা গুপ্তচর রাখিতেন—তাহাদিগকে বলা হইত স্পশ। 'পুরচরিষ্ণু' বা চলমান দুর্গের উল্লেখও এই যুগে দেখা যায়।

৯। প্রত্যেকটি বাসগৃহে থাকিত একটি অগ্নিশালা, একটি বসিবার ঘর, একটি স্ত্রীলোকদের প্রকোষ্ঠ। পিতারা সময় সময় এত নিষ্ঠুরও হইতেন যে পুত্রকে অন্ধ করিয়া দেওয়ার একটি কার্য বিবরণ পাওয়া যায়।

১০। ঋগ্বেদে 'লবণ' সম্বন্ধে কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না।

১১। গবাদি চিহ্নিত করিবার প্রথা বৈদিক যুগে প্রচলিত ছিল কেননা গাভীকে 'অষ্টকর্ণী' বলা হয়। ইহা হইতে মনে হয়—গাভীর কানে আটটি চিহ্ন রাখা হইত। যমুনা উপত্যকায় গাভীর বিশেষ সমাদর ছিল—এবং প্রচুরতাও ছিল।

১২। বেদের যুগের বাণিজ্য সম্ভবতঃ 'পাণী' নামে অনার্যদের হাতে ছিল। তাহারা সভ্য ও কৃপণ ছিল।

১৩। বৈদিক যুগে বিজ্ঞানেরও উন্নতির পরিচয় পাওয়া যায়। ভিষজকে একদিকে যেমন চিকিৎসক অপর দিকে তেমনি হত্যাকারীরূপেও উল্লেখ পাওয়া যায়। লৌহপদের ব্যবস্থা হইতে মনে হয়—শল্যবিদ্যার উন্নতি হইয়াছিল। বৈদিক যুগে কয়েকটি নক্ষত্রের সন্ধান জানা ছিল মনে হয়।

১৪। পরিবর্তিত বৈদিক যুগে আমরা—সংগ্রাহিতৃ (ধনরক্ষক), ভাগদুঘ (কর আদায়কারী), শূদ্র, গোবিকর্তন (মৃগয়ায় রাজার অনুচর) প্রভৃতি কর্মচারির উল্লেখ দেখিতে পাই। কালক্রমে প্রাদেশিক শাসনও প্রবর্তিত হইল।

১৫। গৌতম বুদ্ধের পরিনির্বান আধুনিক ঐতিহাসিকগণ মনে করেন খৃষ্টপূর্ব ৪৮৬ অব্দে হয়।

১৬। বিম্বিসারের রাজধানী গিরিব্রজ পাঁচটি পাহাড়ের মধ্যস্থলে এবং পাথরের প্রাচীরে সুরক্ষিত ছিল। প্রাচীন ভারতে সুরক্ষিত প্রস্তর প্রাচীরের প্রথম সাক্ষাতে এখানেই পাওয়া যায়।

১৭। অজাত শত্রুর আর একটি নাম ছিল কুনিক।

১৮। খারোষ্টি, যাবনানী প্রভৃতি বর্ণমালা সম্ভবতঃ গ্রীক আক্রমণের ফলেই ভারতে সৃষ্টি হয়। মাসিদনীয় আক্রমণের ফলেই ভবিষ্য ভারতে একচ্ছত্র সাম্রাজ্যের চিন্তাধারা আসিয়া পড়ে।

১৯। মগধ প্রাধান্য যুগে ভারতে সকল ক্ষেত্রেই—বংশানুক্রমে রাজা সিংহাসনে আরোহণ করিতেন না। প্রজাদেরও নির্বাচনের অধিকার ছিল, তবে তাহারা—সাধারণতঃ রাজবংশ হইতেই উত্তরাধিকারী নির্বাচন পন্থা অনুসরণ করিত। একজন গ্রীক লেখক বলেন যে পঞ্জাবে একটি জিলায় সুন্দরতম ব্যক্তিকেই রাজা নির্বাচন করা হইত। ক্ষত্রিয় প্রাধান্য ক্রমে কমিয়া আসিতেছিল মনে হয়। শূদ্রদেরও কেহ কেহ সিংহাসনে আরোহণ করিতে সুযোগ পাইত।

২০। সাধারণতঃ বণিক এবং শাসকগণ সহরের কোলাহলের মধ্যে কাজ করিতে ভালবাসিতেন—কিন্তু অধিকাংশ লোকই ধূলামলিন সহর হইতে গ্রামে বাস করিত।

২১। কালক্রমে পূর্ব ভারতে দেখা দিয়াছিল—একদল ভ্রাম্যমান শিক্ষকের তাঁহারা জীবন, কর্মবাদ, জন্মান্তর প্রভৃতির বিশ্বাস করিলেও—বেদের অভ্রান্ততা স্বীকার করিতেন না। সৎকার্যই এঁদের প্রধান প্রচার্য বিষয় ছিল। অহিংসাও একটি সৎকার্যের মধ্যে। এই সমস্ত শিক্ষকের মধ্যে ছিলেন মহাবীর এবং গৌতম বুদ্ধদেব।

২২। মৃত্যুর প্রাক্কালে বুদ্ধদেব তাঁহার শিষ্যদের শেষ উপদেশ দেন, "ধ্বংসই ভাগ্যের রীতি—অপ্রমাদের সহিত তুমি তোমার মুক্তির পন্থার অনুসন্ধানে রত হও।"

২৩। পূর্ণাঙ্গ মহাভারতের সর্বপ্রথম উল্লেখ দেখা যায় গুপ্তযুগের একটি অনুশাসনে। অশ্বলায়ণ এবং পাণিনিতে মহাভারতের উল্লেখ আছে—কিন্তু রামায়ণের সম্বন্ধে, কোনও উল্লেখ নাই। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র-গ্রন্থে উভয়েরই উল্লেখ আছে।

২৪। জনকল্যাণার্থে ২৫৬ রজনী ভ্রমণকার্যে অতিবাহিত করার পর সম্রাট অশোক সন্তুষ্টির সহিত লক্ষ্য করিলেন যে ভারতের লোকেরা এবং সন্নিকটের জম্বু দ্বীপের জনগণ—প্রকৃত ধর্ম এবং দেবতার সহিত পরিচিত হইয়াছে। সম্রাট দশবৎসর অন্তর এই পরিভ্রমণে বাহির হইতেন। তিনি জনসাধারণের মনে এই আশ্বাসবাণী বহন করিয়া আনিলেন যে দেবতা এবং ভগবান একমাত্র ধনীদের সম্ভ্রান্তদের নহে—তাঁহাদের পাইবার অধিকার সকলেরই সমান।

২৫। মেগাস্থিনিসের বিবরণীতে উল্লেখ না থাকিলেও ঐতিহাসিকগণ মনে করেন যে মৌর্য ভারতে দাসপ্রথা প্রচলিত ছিল।

২৬। পাতঞ্জলি 'গ্রন্থিক' নামে এক সম্প্রদায়ের উল্লেখ করেন। তাহারা

মানুষের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত সমস্ত বলিতে পারিত। জৈন স্ত্র-কৃতাঙ্গ—অষ্টপাদ ক্রীড়ার উল্লেখ করে। উহাই পরে পাশাখেলা নামে পরিচিত হয়।

২৭। মৌর্য যুগে গ্রীক এবং রোমিয় সভ্যতার সহিত ভারতের আদান প্রদান চলিত। ব্রোচ এর রাজসভায় পাশ্চাত্যের গায়কগণকে সম্মানিত করা হয়। ভারতীয় দার্শনিকগণকে গ্রীকগণ সম্মান করিতেন।

২৮। সম্রাট হর্ষবর্ধনকে কেহ কেহ গুপ্ত বংশীয়দের রক্তের সহিত সম্পর্কিত বলেন। তিনি সমুদ্র গুপ্তের ন্যায় ভারতে এক অখণ্ড সাম্রাজ্য স্থাপনের পরিকল্পনা করেন। একজন ইউরোপীয় পর্যটক বলেন যে তিনি ছিলেন হিন্দুযুগের আকবর।

২৯। বঙ্গের সেন বংশের স্থাপয়িতা বিজয়সেন পশ্চিমবঙ্গে 'বিজয়পুরে' এবং পূর্ব্ববঙ্গে বিক্রমপুরে তাঁহার রাজধানী স্থাপন করেন। মনে হয় তিনি মাঝে মাঝে বিক্রমপুরের রাজধানীতেও যাইতেন।

৩০। মনে হয় গুপ্ত যুগেই ধীরে ধীরে শাসকজাতি বা রাজন্যবর্গের মধ্যে—স্ত্রীর সহমরণ প্রথা চালু হইতে থাকে।

৩১। দাহিরের বিরুদ্ধে মহম্মদ বীন কাশিমের জয়ের প্রধান কারণ—বৌদ্ধ সন্ন্যাসী এবং কয়েকজন প্রধান সামন্তের বিশ্বাসঘাতকতা। উভয় পক্ষের সৈন্যদলের মধ্যস্থলে এক বিশাল জলরাশি। মহম্মদ বীনকাশিম বিশ্বাসঘাতকদের সহায়তায়—তাহা অতিক্রম করিয়া—দাহিরকে আক্রমণ করে।

৩২। গুপ্তযুগের ধর্ম্মের বিশেষত্ব ছিল ভক্তিধর্ম্মের ক্রমপ্রসার এবং ভগবদ্ভক্তি তথা তাহার স্বষ্ট মানব সেবার ধর্ম্ম এই যুগেই সমধিক প্রচারিত হয়।

৩৩। কুতুব-উদ্দীনের সহিত আরামের কি সম্পর্ক ছিল এই সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেন। কেহ কেহ বলেন—আরাম কুতুবের পুত্র ছিলেন। মিনহাজ সিরাজ বলেন কুতুবের তিন কন্যাই ছিল—পুত্র ছিল না। আবুল ফজলের মতে আরাম ভাই ছিলেন। একজন আধুনিক ঐতিহাসিক বলেন তাহার সহিত কুতুবের কোনও সম্পর্কই ছিল না।

৩৪। ফিরোজ তুঘলকের মাতা ছিলেন অম্বরের রানা মল্লের কন্যা। তিনি মোট পাঁচপ্রকার কর নির্দ্ধারণ করেন। খারাজ (উৎপন্নশস্যের একদশমাংশ), জাকাত (ভিক্ষা), জিজিয়া (অমুসলমানদের উপর কর), খাম (খনিজ কর) এবং শর্ব (খনন কর)।

৩৫। বিজয়নগরের কৃষ্ণদেব রায়ের সম্বন্ধে ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন যে, পর্তুগীজ শাসনকর্তা আলবুকার্ক তাহার নিকট একটি দুর্গ নির্ম্মাণের অনুমতি

প্রার্থনা করেন। পর্তুগীজগণ মুসলমানদের নিকট হইতে গোয়া অধিকার করিলে এই অনুমতি দেওয়া হয়। তাহারা অশ্ব এবং অন্যান্য দ্রব্য সরবরাহ করিত। বিজয়নগরের ছিল ৩০০টি সামুদ্রিক বন্দর।

৩৬। তাল্লিকোটার যুদ্ধ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন বিজেতাগণ যাহা পাইল, তাহাই হরণ করিল। তাহারা অলঙ্কার, মণিমুক্তা, আসবাবপত্র, উট, তাঁবু ও তাহার উপকরণ, পতাকা, ভৃত্য, স্ত্রী-ভৃত্য এবং সমস্ত প্রকার অস্ত্রশস্ত্রই অপহরণ করিল। ফেরিস্তা বলেন, "এই লুণ্ঠন এত বৃহৎ আকারে হইয়াছিল যে সৈন্যদলের মধ্যে প্রত্যেকটি লোকই অতুল সম্পদের অধিকারী হইয়াছিল।" হোসেন নিজাম শাহা রামরাজাকে স্বহস্তে বধ করিয়া বলিলেন, "এতদিনে আমার প্রতিশোধ সার্থক ছিল—আল্লা যাহা করার করুন।

৩৭। রাণা সংগ্রাম সিংহ যখন তাঁহার বিপুল শক্তি, সাহস ও সৈন্যবল লইয়া বাবরের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন, তখন বাবরের ক্ষুদ্র সৈন্যদল রীতিমত ভয় পাইয়া গেল। কিন্তু বাবর নিজে ছিলেন অদম্য-সাহসের অধিকারী এবং অকুতোভয়। তিনি তাহার মদের পাত্র সমূহ ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন, তাঁহার সঙ্গে যে সমস্ত মদ ছিল, সব মাটিতে ঢালিয়া দিলেন এবং শপথ করিলেন যে তিনি আর কখনও তীব্র সুরা পান করিবেন না এবং তাহার সৈন্যদের নিকটও মর্মস্পর্শী আবেদন জানাইলেন। তাহার এই আবেদনের সুফলও হইল।

৩৮। শেরশা কেবল ১৫০০ ক্রোশ দীর্ঘ গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোডই সোণারগিরি গাঁ হইতে সিন্ধুদেশ পর্যন্ত নির্মাণ করান নাই। তিনি আরও চারটি বড় পথ নির্মাণ করান—একটি ছিল আগ্রা হইতে বুরহানপুর, দ্বিতীয়টি আগ্রা হইতে যোধপুর, তৃতীয়টি আগ্রা হইতে চিতোর এবং চতুর্থ টি ছিল—লাহোর হইতে মূলতান পর্যন্ত।

৩৯। শেরশাহের শাসনকালের নিরাপত্তা সম্বন্ধে নিজামউদ্দীন লিখিয়াছেন "পথ-ঘাট এত নিরাপদ ছিল যে যদি কেহ স্বর্ণ লইয়াও মরুভূমিতে রাত্রিতে একা নিদ্রা যাইত তবুও তাহার অর্থ অপহৃত হইবার ভয় ছিল না।

৪০। স্মিথ সাহেব বলেন, "শেরশাহ যদি দুর্ঘটনায় মারা না যাইতেন ভারতে মুঘলদের পুনরভ্যুত্থান হইত কিনা সন্দেহ।"

৪১। আকবর ফতেপুর সিক্রীতে ইবাদাতখানা নির্মাণ করাইলেন—ধর্ম আলোচনার উদ্দেশ্যে। তিনি যখন দেখিলেন যে সুন্নী ধর্মাবলম্বী মুসলমানগণ ঐস্থানে একত্র হইয়া ধর্ম আলোচনার নামে পরস্পরকে আক্রমণ ও গালাগালিই করেন, তখন তিনি বিভিন্ন ধর্মের জ্ঞানী ও দার্শনিকদিগকে সে স্থানে আহ্বান করিলেন।

তাঁহার এই সভায় আসিলেন হিন্দুদার্শনিকদের মধ্যে পুরুষোত্তম এবং দেবী, জৈন দার্শনিক হরিবিজয় সুরী, বিজয়সেন সুরী এবং ভানুচন্দ্র উপাধ্যায়, গোয়া হইতে খৃষ্টান মিশনারিগণ এবং পারশীক যাজকগণ।

৪২। আহার বিষয়ে সম্রাট আকবর ছিলেন অত্যন্ত পরিমিত। তিনি সাধারণতঃ ফল খাইতে ভালবাসিতেন এবং মাংস খাইতে বিশেষ ভালবাসিতেন না। পরবর্তী জীবনে মাংস আহার ছাড়িয়াই দিয়াছিলেন।

৪৩। জাহাঙ্গীর ও নূরজাহানকে কেন্দ্র করিয়া কত কি কাহিনী রচিত হইয়াছে। আধুনিক ঐতিহাসিকগণের মতে মেহেরুন্নিসার বিবাহ হয়—১৭ বৎসর বয়সে আর একজন পারশীক, ভাগ্যান্বেষী আলিকুলীবেগ ইস্তাজী শের আফগানের সহিত। তিনি জাহাঙ্গীরের রাজত্বের প্রথমভাগে বর্ধমানের জায়গীর প্রাপ্ত হন। পরে জাহাঙ্গীরের নিকট সংবাদ গেল বর্ধমানের জায়গীরদার শের আফগান সম্রাটের আদেশ মানিতে চায়না—এবং ক্রমশঃ বিদ্রোহের ভাব দেখাইতেছেন। সম্রাট তখন বাংলাদেশের নবনিযুক্ত শাসনকর্তা কুতুবুদ্দিনকে পাঠাইলেন শের আফগানকে শিক্ষা দিবার জন্য। কুতুবুদ্দিন বর্ধমানে আসিয়া শের আফগানের হস্তে নিহত হইলেন এবং শের আফগানও কুতুবের অনুচরদের হস্তে নিহত হইলেন। মেহেরুন্নিসা এবং তাহার কন্যাকে সম্রাটের দরবারে লইয়া যাওয়া হইল। চার বৎসর পর মেহেরের রূপ ও সৌন্দর্য—সম্রাটকে আকৃষ্ট করায় তিনি তাঁহাকে বিবাহ করিলেন। জাহাঙ্গীরের সহিত মেহেরুন্নিসার পূর্ব প্রণয়ের কাহিনী আধুনিক ঐতিহাসিকগণ অনেকেই স্বীকার করিতে চাননা। তবে জাহাঙ্গীর যে এই সমস্ত বিষয়ে দোষমুক্ত ছিলেন না তাহাও 'আনারকলি'র কাহিনী হইতে জানা যায়।

৪৪। জাহাঙ্গীরের সুবিচারঘণ্টা রজ্জুতে ৬০টি ঘণ্টা বাঁধা ছিল।

শাজাহানের রাজত্বে জাঁকজমকের অন্তরালে ছিল দৈন্য নিহিত। বার্ণিয়ারের বিবরণ হইতে জানা যায় যে প্রাদেশিক শাসকদিগের অত্যাচারে দেশের শ্রমিক এবং শিল্পীগণকে অনাহারে থাকিতে হইত। এই দৈন্যের পরিণতি দেখা দিল—ঔরঙ্গজীবের আমলে। চারদিকে অশান্তির বহ্নি জ্বলিয়া উঠিল।

৪৫। সম্রাট ঔরঙ্গজীবের শেষের পাঠানের চিঠিগুলি বড়ই মর্মস্পর্শী। তিনি তাঁহার পুত্র আজমকে লিখেন, "আমি একাই এসেছিলাম—একাই যাচ্ছি—আমি আমার দেশ এবং দেশবাসীর মঙ্গল করিনি। ভবিষ্যতের কোনও আশাই রেখে গেলাম না।" আর একখানা চিঠি তিনি শেখবক্সের নিকট লিখিলেন,

"আমি আমার ভুল ত্রুটির ভার বয়ে লয়ে যাচ্ছি—যাহাই আসিবার আসুক—আমি আমার নৌকা ভাসিয়ে দিলাম।" অবশেষে ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে ৩রা মার্চ প্রাতঃকাল—তিনি আহাম্মদ নগরে প্রাণত্যাগ করেন।

৪৬। পলাশীর যুদ্ধের প্রাক্কালে নন্দকুমার ছিলেন হুগলীর ফৌজদার—এবং তাঁহার অধীনে বিরাট একটি বাহিনীও ছিল চন্দননগরের নিকটে। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে যখন ইংরাজগণ ফরাসীদের চন্দন নগর দখল করেন—তখন যদি নন্দকুমার চন্দন নগর হইতে সরিয়া না যাইতেন—তবে ইংরাজগণ কোনও প্রকারে চন্দন নগর দখল করিতে পারিত না। ইহা একপ্রকার ঐতিহাসিক সত্যরূপে সৃষ্টি হইয়াছে যে নন্দকুমার ইংরাজদের নিকট ঘুস খাইয়াছিলেন।

৪৭। তাই পরে নন্দকুমারের বিচার কালের সম্বন্ধে রবার্টস ঠিকই লিখিয়াছেন—"এই সমস্ত দুষ্ট প্রকৃতির লোকেরা নিজদের কাজের জন্য নন্দকুমারকে প্রয়োগ করিয়া পরে তাহাকে নেকড়ে বাঘের মুখে ফেলিয়া দিল।" নন্দকুমার একেবারে নির্দোষ ছিলেন যে বলা হয়—একথা সত্য নহে।

বিবিধ

সামাজিক বনাম রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ইতিহাস

আধুনিক শিক্ষাবিদ্গণের কাহারও মত যে ইতিহাসের রাজনৈতিক দিকটাই বড় করিয়া ছাত্রদিগের নিকট ধরিয়া শিক্ষা দিলে প্রকৃত ঐতিহাসিক শিক্ষা দান করা হয়। আমরা পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে এই মত মানিয়া নিলেও নিতে পারিতাম—কিন্তু এখন আর তাহা মানিব না। অন্যদল বলেন ইতিহাস যদি রাজনৈতিক কাহিনী, রাজার উত্থান পতনের মধ্যেই নিবদ্ধ থাকে—তবে দেশের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থাতো সম্পূর্ণ অন্ধকারেই থাকিয়া গেল। একথা হয়তো সত্য যে অর্থনৈতিক অবস্থাতো রাজনৈতিক অবস্থার উপরই নির্ভর করে। আবার এই কথাও সত্য যে রাজনৈতিক ঘটনাবলিকে যদি কেন্দ্র করিয়া অধ্যাপনার সূত্র গ্রথিত করা না যায়—তবে তো নিরবচ্ছিন্ন সূত্র গাথা সম্ভব হয় না। কিন্তু রাজনৈতিক ইতিহাস অধ্যাপনার ত্রুটিও যথেষ্ট আছে। ইতিহাস সমাজ জীবনের বিভিন্ন অংশের কাহিনীস্বরূপ হইবে—ইহার মধ্যে কেবল রাজনৈতিক কাহিনী টানিয়া আনিলে চলিবে কেন? আর অর্থনৈতিক বা সামাজিক অবস্থাও যে সময় সময় রাজনৈতিক ইতিহাস রচনা করে—তাহার

প্রমাণ তো রহিয়া গিয়াছে—ফরাসীবিদ্রোহ, ইংলণ্ডের কৃষক বিদ্রোহে। আবার ইহাও দেখা যায় যে রাজনৈতিক ইতিহাস কেবল রাজা মহারাজাদের সেনানীর কথা লইয়াই থাকে। অনেক সময় ইহা কেবল রণকাহিনী লইয়াই বিব্রত হয়। আমরা অতীতের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখিতে পাই যে যুদ্ধের রাজনৈতিক কাহিনীই সেখানে প্রবল।

আবার কেহ বলেন যে কেবল দেশের অর্থনৈতিক ইতিহাসই পড়াইতে হইবে, কেননা—অর্থনৈতিক ভিত্তিইতো সমাজ জীবনের এবং রাজনৈতিক জীবনের প্রধান কাঠাম এবং যুগে যুগে সমগ্র আন্দোলনের ইতিহাস অনুসন্ধান করিতে গেলে দেখা যাইবে যে অর্থনৈতিক প্রয়োজনে সমস্ত গড়িয়া উঠিয়াছে।

এই যুক্তিবাদীদের বিপক্ষে বলা যায় যে, অর্থই তো জীবনের পরমার্থ নহে। একটা দেশ বা একটা জাতির মঙ্গল অর্থ হইতেই আসে না। তাহার লক্ষ্য থাকে বৃহত্তর। সম্রাট অশোক বা হর্ষবর্দ্ধনের মত রাজার আমলে কি আমরা অর্থনৈতিক ইতিহাসের প্রাধান্য দেখি না কৃষ্টি বা ধর্মজীবনের পরিচয় পাই? মানুষের জীবনে রহিয়াছে আত্মীয়তার বন্ধন, ধর্মবন্ধন, সামাজিক বন্ধন—অর্থনৈতিক ইতিহাস তাহার কি সন্ধান দিবে?

এবার সামাজিক ইতিহাসবাদীদের মত পরীক্ষা করা হইতেছে। তাঁহারা বলেন সামাজিক ইতিহাসই তো প্রকৃত ইতিহাস। ইহার মধ্যে রহিয়া গিয়াছে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, শিল্প কৃষ্টি, সাধারণ জীবন প্রণালী সবই। তাই যদি হয়, তবে আমরা কি ভিত্তিতে পড়াইব?

এই সমস্যার মধ্যে আমরা কি করি? এই বিষয়ে আমাদের কি নীতি হওয়া উচিত? প্রধানতঃ আমাদের দেখা দরকার—দেশের ইতিহাসকে বিভিন্ন অংশে কি ভাবে ভাগ করা যায়। তারপর লক্ষ্য রাখিতে হইবে কোন যুগে কোন বিষয় প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল—সে অনুসারে সেই বিষয়টি লক্ষ্য রাখিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। অন্য বিষয়গুলিও উপেক্ষা না করিয়াও তাহার প্রতি যথাযথ মনোযোগ দিতে হইবে। আমরা গুপ্তযুগের সভ্যতার প্রাধান্য দেখাইতে গিয়া সমুদ্রগুপ্তের রাজ্য বিজয় কাহিনীকেও উপেক্ষা করিব না। সর্বোপরি ইহাও লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে যাহাই পড়ান হউক না কেন উহা যেন পরস্পরের সহিত অন্বিত থাকে এবং ইতিহাসের ধারাও যেন অক্ষুণ্ণ থাকে।

একটি নির্দিষ্ট পাঠের নমুনা (Assignment)

বিষয়—নাদিরশাহের ভারত আক্রমণ

ভূমিকা ঃ—দিল্লীর সম্রাটের দুর্বলতা এবং পথঘাটের উপর শিথিল দৃষ্টি।

লক্ষ্য কর যে নাদিরশাহ আসিলেন পারশ্য হইতে। এবার নাদিরশাহের ভারত আক্রমণ পড়িয়া যাও।

সম্মুখে একটি মানচিত্র রাখ অথবা উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের ভারতের একটি মানচিত্র অঙ্কন করিয়া লও।

লক্ষ্য কর যে ১৭৩৮ সালে তাহার অভিযান সুরু।

দিল্লীর প্রথম শান্ত অবস্থা—এবং পরে—নাদিরের অনুচরদের হত্যার বীভৎসতায় নাদিরের হত্যার আদেশ দিলেন।

নাদিরশাহ কি কি লইয়া গেলেন—দেখ। পড়া হইয়া গেলে—নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর লিখ।

(ক) নাদিরশাহ এবং তাহার অনুচরগণ কোন্ সুযোগে ভারতে প্রবেশ করিতে পারিয়াছিলেন?

(খ) নাদিরশাহের বাল্য জীবনী বর্ণনা কর।

(গ) নাদিরশাহের দিল্লীর অবস্থানের পর দিনের বর্ণনা কর।

(ঘ) নাদিরশাহ ভারতবর্ষ হইতে কি কি লইয়া গেলেন?

সাধারণতঃ এই নির্দিষ্ট পাঠ (Assignment) এক সপ্তাহ বা নির্দিষ্ট কয়েক-দিনের জন্য স্মরণ থাকে। শিক্ষক এই পাঠক্রম পরিচালনাকালে লক্ষ্য রাখিবেন যেন শিক্ষার্থীগণ স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে অগ্রসর হইতে পারে এবং ইতিহাসের আধুনিক তথ্য সমূহেরও সন্ধান পায়।

ছাত্রগণ যখন নির্দিষ্ট অংশটি ধীরে ধীরে পড়িতে থাকে, শিক্ষক মহাশয়, সেই সময় বোর্ডে প্রশ্নসমূহ বা সাহায্যমূলক নির্দেশ দিতে থাকেন। এই প্রকার পাঠ দানের বিশেষত্ব এই, একসঙ্গে দ্রুত পাঠের গতি উন্নত করা যায়।

একটি পাঠটীকা

শ্রেণী—অষ্টম শ্রেণী।

সময়—৪৫ মিনিট।

বিষয়—শেরশাহ।

ভূমিকা	প্রশ্ন
ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের স্থাপয়িতা বাবর। হুমায়ুন অর্থ ভাগ্যবান।	(ক) পানিপথের যুদ্ধের ফল কি হইয়াছিল ? (খ) অতঃপর বাবরকে কে বাধা দিল ? (গ) তাহার ফল কি বুঝা গেল ? (ঘ) হুমায়ুনকে বাবর দৃঢ় ভিত্তি দিয়া গিয়াছিলেন কি ? (ঙ) হুমায়ুনের চারদিকের অবস্থা কি ছিল ?

আজ আলোচনা হবে শের খাঁ বা শেরশাহের বিষয়।

ফরিদের বাল্যজীবন অদৃষ্ট বঞ্চিত, বারংবার পিতৃস্নেহ হইতে বঞ্চিত। ক্রমশঃ ক্ষমতা বিস্তারের কাল—চৌসা ও কনৌজের যুদ্ধে হুমায়ুনকে হারাইয়া দিল্লীর সিংহাসন দখল।	(ক) ফরিদের বাল্যজীবন সম্বন্ধে যাহা জান বল ? (খ) হুমায়ুন ফরিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন কেন ? (গ) মানচিত্রে যুদ্ধের স্থান কয়টি

[ব্ল্যাকবোর্ডে শের খাঁ ও হুমায়ুনের পরস্পরের অভিযান ক্ষেত্র চক সাহায্যে অঙ্কন করিয়া দেখাইতে হইবে]

শের খাঁ মালব, গোয়ালিয়র, পাঞ্জাব জয় করেন। কালিঞ্জর দুর্গ অবরোধ কালে বারুদের আগুনে মৃত্যু হয়। মাত্র পাঁচ বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার বিভিন্ন সংস্কার। পথঘাট নির্মাণ। ডাক চলাচলের ব্যবস্থা। সৈন্যদলের কথা।	(ক) শেরশাহ কি কি রাজ্য জয় করেন ? (খ) মালব জয় কালে তিনি কি বলিয়াছিলেন ? (গ) তাহার মৃত্যু হয় কি ভাবে ? (ঘ) শাসনের সুবিধার জন্য শেরশাহ কি ভাবে তাহার রাজ্যকে ভাগ করেন ?

ভূমিকা	প্রশ্ন
	(ঙ) জমির বিষয়ে তিনি কি বন্দোবস্ত করেন ?
	(চ) যাতায়াতের সুবিধার জন্য তিনি কি করিয়াছিলেন ?
	(ছ) তাহার সৈন্যদল সম্বন্ধে কি জান ?
	(জ) শেরশাহকে আকবর ও অশোকের সহিত তুলনা করা হয় কেন ?

সারাংশ :—চৌসা ও কনৌজের যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া শের খাঁ দিল্লীর সিংহাসনে বসেন। তিনি পাঞ্জাব, গোয়ালিয়র মালব ও কালিঞ্জর দুর্গ জয় করেন। বারুদের আগুনে তাঁহার মৃত্যু হয়।

রাজ্যকে ৪৭টি সরকারে ভাগ করেন। সরকারকে পরগণায় ভাগ করেন। জমি জরিপ করাইয়া পাট্টা ও কবুলিয়ত দিবার বন্দোবস্ত করেন।

যাতায়াতের সুবিধার জন্য গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোড নির্মাণ করেন। ডাক চলাচলের ব্যবস্থা করেন।

সৈন্যদলে দেড় লক্ষ অশ্বারোহী এবং পঁচিশ হাজার ছিল। উচ্চপদস্থ হিন্দু কর্মচারীও ছিল। শেরশাহকে আকবর ও অশোকের ন্যায় একজন ভাল রাজা বলা হয়।]

[শিক্ষক অতঃপর ছাত্রদের অতিরিক্ত তথ্য দিতে পারেন—ইহা এই পুস্তকের এক অংশে দেওয়া আছে।]

জ্ঞানের ভিত্তি দৃঢ় করিবার উদ্দেশ্য

গৃহের কাজ :—

ভারতবর্ষের একটি মানচিত্র অঙ্কিত করিয়া শেরশাহের রাজ্য-বিজয় দেখাও।
শেরশাহের সংস্কার ও বিবিধ সংস্কার সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখ।

বিষয়ান্তরের সহিত সম্পৃক্তকরণ (Correlation)

পরিভাষা

Art—কলা।
Culture—সংস্কৃতি, কৃষ্টি।
Syllabus—পাঠ্যসূচী, পাঠ্য বিষয়।
Scope—গণ্ডী।
Concentric method—কেন্দ্রীভূত প্রথা।
Chronological Periodid—সময়ানুক্রমিক প্রথা
Tropical treatment—নির্দ্দিষ্ট বিষয়ক্রম প্রথা।
The progressive method—প্রত্যাবর্তনশীল বা প্রতিগামী পন্থা।
Presentation—উপস্থাপন।
Stage—স্তর।
Time scale—যুগরেখা।
Graph—লেখন।
Correlation—পারম্পর্য স্থাপন, অনুবন্ধ
Source—প্রভব।
